

ভারতীয় নারী

স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতীয় নারী

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

১১শ সংস্করণ
১৩৬০

মূল্য এক টাকা চার আনা

প্রকাশকের নিবেদন

নর-নারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক স্বামী বিবেকানন্দের নির্ম্মল চিত্তে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহার এমন একটা সনাতন রূপ আছে যাহা কালের বিপর্য্যয়ে ম্লান হয় না। নারী-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি তাই আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও সমভাবে উজ্জ্বল ও সমাজ-জীবনে উপযোগী। কারণ, তিনি ছিলেন 'আমূল-সংস্কারক'; সদা পরিবর্ত্তনশীল সমাজের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য তিনি সংস্কারের কৃত্রিম উৎস রচনা করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন সমাজের জীবনীশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে—যাহাতে তাহার হৃদয়ের আনন্দের শতধারা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইতে পারে।

বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বিবেকানন্দের গ্রন্থোদ্যান হইতে সেই চির-নূতন ভাবপুষ্পগুলি চয়ন করিয়া আমরা মাতৃপূজার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সুসজ্জিতাকারে এই মাল্য রচনা করিলাম। বর্ত্তমান পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়টি আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। উহা ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে একটি আলোচনা ও 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পত্রে প্রকাশিত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একখানি পত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত

স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলী এবং ভগ্নী নিবেদিতার 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থ হইতেও অংশ-বিশেষ সঙ্কলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শেষোক্ত পুস্তকের একটি প্রবন্ধও সংযোজিত হইয়াছে। উহাতে স্বামীজীর পরিকল্পিত ভাবী নারী-সমাজের একখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে। এই পরিশিষ্ট ব্যতীত আর সঙ্গতির সকল অংশই স্বামীজীর নিজের। কেবল ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্তিগুলির স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত দুই-একটি ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের আকারগত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন অংশ একত্র সংযোজিত করিতে গিয়া কচিৎ দুই-একটি শব্দ যোগ করা হইয়াছে; বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে স্বামীজীর ভাব বা ভাষার কোন হানিই হয় নাই।

সূচীপত্র



হিন্দু পরিবার

এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র
ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব,
স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়,
পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না।

হিন্দু পরিবার

আমি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা বিবাহ করেন না। সুতরাং নারীর সম্বন্ধে মাতা, স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনী-সম্পর্কীয় পূর্ণ অভিজ্ঞতা অপরের ন্যায় আমায় থাকা সম্ভবপর নহে। যদিও আমি ধর্ম্মপ্রচারকরূপে অবিরত দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংস্পর্শে আসিয়া স্ত্রীজাতির সাধারণ পরিচয়লাভের সুযোগ অনেকের অপেক্ষাই অধিক পাইয়াছি, (এমন কি উত্তর-ভারতে পর্দ্দা-প্রথার সমধিক প্রচলন সত্ত্বেও ঐ দেশীয় মহিলারা ধর্ম্মের খাতিরে ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমার ন্যায় পরিব্রাজকের সহিত বাক্যালাপ করিতে বা আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই) তথাপি আমি জোর করিয়া এ কথা বলিতে পারি না যে, আমি ভারতীয় নারী-সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ।

সুতরাং আমি মাত্র ভারতীয় নারীর আদর্শ-সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করিব। প্রত্যেক জাতির নরনারীই একটি আদর্শকে অবলম্বন করে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ উহাই তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শের একটি বিশেষ বহিঃপ্রকাশ। এইরূপ ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই জাতি। ঐ জাতির আবার এমন একটা উচ্চ আদর্শ আছে, যাহার দিকে তাহার গতি নিরন্তর চলিয়াছে। সুতরাং এ ধারণা অতি সত্য যে, কোনও জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহার আদর্শের পরিচয় আগে পাওয়া আবশ্যক।

কারণ অপর জাতির অবলম্বিত আদর্শ দ্বারা বিচার করিলে কোন জাতিরই সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

বৃদ্ধি, উন্নতি, সমৃদ্ধি বা অবনতির সর্ব্বপ্রকার ধারণাই আপেক্ষিক। এইগুলির একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি আছে; কোনও মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার সেই মাপকাঠি অনুযায়ীই তাহাকে বিচার করিতে হইবে। ইহা একটা জাতির জীবনে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এক জাতির দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, অপর জাতির দৃষ্টিতে তাহা নাও হইতে পারে। নিকটসম্পর্কীয় ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ এতদ্দেশে (আমেরিকায়) সম্পূর্ণ অনুমোদিত, কিন্তু ভারতে উহা আইন-বিরুদ্ধ, শুধু আইন-বিরুদ্ধ নহে, উহাকে বীভৎস ব্যভিচারের সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হয়।

এতদ্দেশে বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ। পরন্তু ভারতের উচ্চ বর্ণের মধ্যে নারীর পুনর্বিবাহ সম্পূর্ণ ব্যভিচার। এখন দেখিতেছেন, আমাদের কার্য্যকলাপ এইরূপ বিভিন্ন ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এক জাতিকে অপরের আদর্শের দ্বারা বিচার করা শুধু অন্যায় নহে, উহা অসম্ভবও বটে। আমাদের জানা উচিত, ঐ জাতি কোন্ বিশেষ আদর্শকে গড়িয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমরা এই সাধারণ ধারণা লইয়াই অগ্রসর হই যে, সকল জাতিরই আদর্শ একরূপ। যখন আমরা বিচার করি, তখন কার্য্যতঃ ইহাই দাঁড়ায় যে আমাদের পক্ষে যাহা ভাল, তাহা অপরের পক্ষেও নিশ্চিতই ভাল; আমরা যাহা করি তাহাই ঠিক, আর আমরা যাহা না করি অপরের পক্ষেও তাহার অনুষ্ঠান অতিশয় গর্হিত। আমি কেবল সমালোচনার জন্য ইহা

বলিতেছি না; আমি চাই, এই সত্য আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করুক। আমেরিকান নারীগণ যখন চীনা নারীদের লৌহপাদুকা ব্যবহার করিয়া পা ছোট করাকে নিন্দা করেন, তখন বোধ হয় তাঁহারা ভুলিয়া যান তাঁহারা যে করসেট্ (corset) ব্যবহার করেন তাহা অধিকতর অনিষ্টকর। ইহা ত মাত্র একটি উদাহরণ। আপনারা মনে রাখিবেন, ঐ করসেট্ পরার দরুণ স্নায়ুর বিকৃতি এবং মেরুদণ্ড বক্র হওয়ায় দেহের যে ক্ষতি হয় তাহার তুলনায় পা ছোট করাতে লক্ষাংশের একাংশও হয় না। মাপ লইবার কালে এই সকল বক্রতা ধরা পড়ে। এ সকল কথা আমি কেবল দোষ ধরিবার জন্য বলিতেছি না; আমি শুধু আপনাদিগকে দেখাইয়া দিতে চাই যে, আপনারা যেমন নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অপর দেশীয় রমণীদের আচরণে একেবারে চম্‌কাইয়া উঠেন, তেমনি তাঁহারাও আপনাদের অনুকরণ না করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারাও আপনাদের রীতনীতি দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠেন। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে একটা বুঝার গোল আছে। কিন্তু এমন একটা সাধারণ ভিত্তি আছে, একটা সাধারণ বুঝিবার জায়গা আছে, একটা সাধারণ মানবধর্ম্ম আছে, যাহা আমাদের কাজের সার্ব্বজনীন ভিত্তি হইতে পারে। যে মানব-প্রকৃতির আংশিক বিকাশ সর্ব্বত্র দেখা যায়, আমাদিগকে মানবের সেই সম্পূর্ণ প্রকৃতিটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রকৃতি কোন ব্যক্তিকে সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণতা দেন নাই। আপনি একটি বিশেষ ভূমিকা লইয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে নামিয়াছেন। যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, আমারও একটু কিছু করিবার আছে—অপরেরও সামান্যভাবে কিছু করিবার আছে।

তেমনি আর এক জনের। ব্যষ্টি সমবেত হইলেই সমষ্টি হয়। ব্যক্তির পক্ষে যাহা, জাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই। প্রত্যেক জাতিরই কিছু করিবার আছে, প্রত্যেকের উপরেই মানব-প্রকৃতির একটা দিক বিকাশ করিবার ভার। আমাদিগকে এই সকল ভাবই একত্রে লইতে হইবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত এমন কোনও জাতির উদ্ভব সম্ভব, যাহা বিভিন্ন জাতির উপলব্ধ বিশেষ বিশেষ অপূর্ব্ব সিদ্ধিসকল সম্মিলিত করিবে এবং এইরূপে এমন এক নবজাতির উদ্ভব হইবে যাহা জগৎ পূর্ব্বে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। এই কথাটি ছাড়া আমার আলোচ্য আর কিছুই নাই। আমি জীবনে ভ্রমণ কম করি নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত রাখিয়াছি। যতই পরিভ্রমণ করিতেছি ততই আমার মুখ বন্ধ হইয়া যাইতেছে, সমালোচনা করিবার আর কিছুই থাকিতেছে না।

ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি, তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে—মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তাহার শেষ। নারী-শব্দ-উচ্চারণেই হিন্দুর মনে মাতৃভাবের উদয় হয়। ভগবানকে তাহারা মা বলিয়া ডাকে। বাল্যাবস্থায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রত্যহ প্রাতে মার পাদোদক পান করে।

পাশ্চাত্ত্যে নারী—স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারী-শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। পাশ্চাত্ত্যে স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী; পরন্তু ভারতের পরিবার মাতার কর্ত্তৃত্বাধীন। পাশ্চাত্ত্য পরিবারে মা আসিলে তাঁহাকে স্ত্রীর অধীনে থাকিতে হয়, কারণ স্ত্রীই সেই পরিবারে সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু মা সর্ব্বদা আমাদের পরিবারেই

থাকেন এবং স্ত্রীকে তাঁহার অধীনে থাকিতে হয়। দেখুন, ভাবগত পার্থক্য কতদুর।

আমি শুধু তুলনার ইঙ্গিতমাত্র করিতেছি এবং উভয় পক্ষ তুলনা করার পর সত্য বিবৃত করিতেছি। এখন নিজেরাই তুলনা করুন। আপনারা যদি প্রশ্ন করেন, নারীরূপে ভারতীয় মহিলার স্থান কোথায়? ভারতবাসীও প্রশ্ন করে, মাতারূপেই বা আমেরিকান্ মহিলার স্থান কোথায়? যাঁহার নিকট হইতে আমরা এই শরীর পাইয়াছি, সেই মহিমময়ী কিংস্বরূপা? কে তিনি, যিনি আমায় দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন? তাঁহার স্থান কোথায়, যিনি প্রয়োজন হইলে আমার জন্য সহস্রবার জীবন দিতে প্রস্তুত? তাঁহার স্থান কোথায়, যাঁহার স্নেহ আমার শত অপরাধ, শত পাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চিরকাল সমধারায় প্রবাহিত? যে স্ত্রী একটু দুর্ব্যবহারেই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য বিচারালয়ে ছুটিয়া যায়, সেই স্ত্রীর সঙ্গে তুলনায় মায়ের স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? হে আমেরিকান্ মহিলাগণ, বলুন, তাঁহার স্থান কোথায়? এদেশে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবার ভরসা করি না। এদেশে এমন পুত্র আমি দেখি নাই যে মাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেয়। মৃত্যুসময়েও আমরা স্ত্রীপুত্রকে মায়ের স্থান অধিকার করিতে দিই না। মা আমার—তাঁহার আগে যদি আমরা মরি তবে আমরা তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে চাই। তাঁহার স্থান কোথায়? নারীর নারীত্ব কি শুধু এই রক্তমাংসের শরীরের সহিত জড়িত? দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতে হইবে—এমন আদর্শ চিন্তা করিতেও হিন্দু ভয় পায়। না না, নারী, রক্তমাংসের সহিত সম্বদ্ধ এমন বস্তুর সহিত তোমাকে

কখনও জড়িত করিতে পারিব না! তোমার নাম চিরকালের মত পবিত্র হইয়া আছে; কারণ 'মা' এই একটি শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন্ শব্দ আছে, যাহার সম্মুখীন হইতে কাম সাহস করে না, বা যাহাকে কোনও পশুত্ব স্পর্শ করিতে পারে না? ভারতের হইল ইহাই আদর্শ।

আমাদের সম্প্রদায় অনেকটা আপনাদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীদের মত—বেশ-বিন্যাসে তাচ্ছিল্য, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবনধারণ, যত্রতত্র শয়ন এবং জিজ্ঞাসুকে ধর্ম্ম-উপদেশদান—এই ভাবে আমাদের জীবনযাপন করিতে হয়। আমাদের সম্প্রদায়ের প্রথা অনুসারে প্রত্যেক নারীকে, এমন কি ছোট বালিকাকে পর্যন্ত মা বলিতে হয়। পূর্ব্ব অভ্যাসের ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশে আসিয়াও আমি 'মা' বলিয়া ফেলায়, তাঁহারা একেবারে চমকাইয়া উঠিতেন। কেন যে এরূপ হইত তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না। অবশেষে কারণ খুঁজিয়া পাইলাম—উহাতে তাঁহাদিগকে বৃদ্ধা মনে করা হয়।

ভারতের নারীত্বের পরাকাষ্ঠা হইল মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব্ব স্বার্থ-লেশহীনা, সর্ব্বংসহা, ক্ষমাস্বরূপিণী মা-ই আমাদের আদর্শ—স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া। মায়ের আদর্শে জীবনগঠনই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। মা—ভালবাসার আদর্শস্বরূপা; তিনি পরিবারের কর্ত্রী, পরিবার তাঁহারই। ভারতে পিতাই অন্যায় ও কুকর্ম্মের জন্য প্রহার করেন, মা হন রক্ষয়িত্রী। এই দেশে কিন্তু শাসনের ভার পড়িয়াছে মায়ের উপর, আর পিতাকে হইতে হয় রক্ষাকর্ত্তা—দেখুন আদর্শের তফাৎ! সমালোচকের দৃষ্টিতে আমি ইহা বলিতেছি

না, আপনারা যাহা কিছু করিতেছেন সবই ভাল; কিন্তু যুগযুগান্তর হইতে আমরা যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহাই আমাদের চলিবার ধারা। ভারতে মায়ের মুখে কখনও সন্তানের প্রতি অভিশাপ শুনিবেন না। তিনি কেবল ক্ষমাই করিয়া যান। ভগবানকে 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা না বলিয়া আমরা সর্ব্বদাই 'মা' বলিয়া থাকি। এই শব্দ ও ভাব হিন্দুর মনে অপার ভালবাসার সহিত জড়িত, কারণ এই মর-জগতে মায়ের ভিতরেই আমরা ভগবানের ভালবাসার আভাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাই। রামপ্রসাদাদি জগন্মাতার উপাসক সাধকগণের সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা বলিতেছেন, "কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়।"

ভারতে হিন্দু মায়ের স্থান এইরূপ। বধূ তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইয়া গৃহে আসেন। একদিকে মায়ের নিজের কন্যা যেমন বিবাহের পর অন্য গৃহে চলিয়া গেল, অপর দিকে তেমনি পুত্র বিবাহ করিয়া তাঁহাকে আর একটি কন্যা আনিয়া দিল। তাঁহাকে গৃহ-কর্ত্রী মায়ের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে। আমি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহারা কখনও বিবাহ করে না, আমিও বিবাহ করি নাই। কিন্তু যদি করিতাম, আর আমার স্ত্রী যদি মায়ের অবাধ্য হইত, তবে আমিও স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতাম না। —কেন? কারণ আমি মায়ের পূজক। তাঁহার পুত্রবধূও না হইবে কেন? আমি যাঁহার পূজা করি, সেও তাঁহাকে পূজা করিবে না কেন? সে আবার কে যে আমাকে অবহেলা করিয়া আমার মাকে শাসন করিবে? নারীত্বের পূর্ণতম বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। মাতৃত্বলাভই নারীর নারীত্বের একমাত্র

সার্থকতা। মা না হওয়া পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করুক, তখন আবার সেও ঐরূপ ক্ষমতা পাইবে।

হিন্দুমতে মা হওয়াই নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য। হিন্দুর এই আদর্শ পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে কত পৃথক—উভয়ের মধ্যে যেন আকাশ-পাতালের ব্যবধান! আমার জন্মের পূর্ব্বে আমার পিতামাতা সন্তানকামনায় বহুবর্ষ ধরিয়া ব্রত-উপবাস করিয়াছিলেন। কারণ ভারতে সাধারণতঃ সন্তানের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহারা ঐরূপ ব্রত-উপবাস করিয়া ভগবানের নিকট সৎপুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। আমাদের স্মৃতিকার ভগবান মনু 'আর্য্য' সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, "সৎসন্তান-কামনার ফলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, সেই আর্য্য।" ভগবানের নিকট সন্তানোদ্দেশ্যে প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহাদের জন্ম হয় স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনার্য্য। সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট কামনা করিতে হইবে। অভিশাপ, অসন্তোষের মধ্যে যাহাদের জন্ম, সংযমের অসামর্থ্যহেতু উত্তেজনার অতর্কিত সুযোগে যাহারা জগতে আবির্ভূত হয়, সেই সব সন্তানের কাছে কী আশা করা যাইতে পারে? আমেরিকান জননীগণ, আপনারা অবহিত হউন। একবার প্রাণে প্রাণে ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনারা যথার্থ নারী হইতে প্রস্তুত কি না। দেশ, কুল এবং জাতীয়তার মিথ্যা গর্ব্বের স্থান সেখানে নাই। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে, এই দুঃখসঙ্কুল জগতে কে এমন আছে যে গর্ব্বের সাহস রাখে? ভগবানের অনন্ত শক্তির নিকটে আমরা কত তুচ্ছ! আপনাদের নিকট আজ আমার এই জিজ্ঞাস্য, সৎসন্তানলাভের জন্য কি আপনারা সকলেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন? নিজের মনকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন

দেখি। মা হওয়ার জন্য কি আপনারা ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ? মা হইয়াছেন বলিয়া কি আপনারা নিজেকে পবিত্র মনে করেন? যদি না করেন, তবে আপনাদের বিবাহ প্রবঞ্চনা, আপনাদের নারীত্ব ব্যর্থ এবং শিক্ষা কুসংস্কার। যদি আপনাদের সন্তানজন্মের মূলে ভগবানের নিকট সৎসন্তানের জন্য কামনা না থাকে, তবে তাহা ত মনুষ্যসমাজের পক্ষে অভিশাপ। এখন দেখুন কিরূপ দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শ উপস্থিত! মাতৃত্বের উপর কত বড় দায়িত্ব! ইহাই হইল ভিত্তি, এখান হইতে অগ্রসর হউন। মাকে কেন এত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিব? কারণ আমাদের শাস্ত্র বলে জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যান, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়ুন, আর জগতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশুন, পরিণামে দেখিবেন যে জন্মগত শুভসংস্কারই আপনার সাফল্যের যথার্থ কারণ। জন্ম হইতে আপনার সদসৎ অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। শিক্ষা এবং অপরাপর জিনিস সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। আপনি যেমন জন্ম পাইয়াছেন, তেমনই থাকিবেন। খারাপ স্বাস্থ্য লইয়া জন্মিয়াছেন, এখন সমগ্র ঔষধালয় সেবন করিলেই কি আপনি সারা জীবনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন? দুর্ব্বল, রুগ্ন, দূষিত-রক্ত পিতামাতা হইতে সুস্থ সবল কয়জন সন্তান জন্মাইতে পারে? বলুন—কয়জন?—একটিও নয়। সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তির প্রবল সংস্কার লইয়া আমরা জগতে আসি। জন্ম হইতেই আমরা দেব বা দানব। আমাদের জীবনের উপর শিক্ষা বা অন্য কিছুর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে অতি

সামান্য। শাস্ত্রের বিধান—জন্মের প্রাক্কালীন প্রভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

মাকে পূজা করিব কেন? কারণ তিনি পবিত্রা। কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি নিজেকে পুণ্যস্বরূপিণী করিয়াছেন। কারণ, স্মরণ রাখিবেন কোন ভারতীয় রমণী আপন শরীর পুরুষকে বিলাইয়া দিবার কল্পনাও করিতে পারেন না। দেহের মালিক তিনি নিজেই। 'দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' * বলিয়া বর্ত্তমানে ইংরেজেরা এক নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসীরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে নারাজ। পুরুষ যখন স্ত্রীর দৈহিক সংস্পর্শে আসে, তাহার পূর্ব্বে স্ত্রী কতই না প্রার্থনা ও মানত করিয়া উপযুক্ত সংযত ভাব অবলম্বন করে।

যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহা ভগবানেরই প্রতীকস্বরূপ। একটি নূতন জীব কোনও এক প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া জগতে আসিতেছে। একটি পবিত্র নূতন জীবকে জগতে আনিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মিলন—সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাহাদের এক সর্ব্বোচ্চ মিলিত প্রার্থনা। এ কি কৌতুক? একি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা? হিন্দু বলে, 'না না, কখনই না।'

এই মাতৃভাবোপাসনা-প্রসূত আর একটি ভাবের কথা এইবার বলিব। অশেষ দুঃখক্লিষ্টা, সর্ব্বংসহা মায়ের ভালবাসাই আমাদের

* এই আইন অনুসারে যে-কোনও বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর উপর সহবাসের দাবী করিতে পারে এবং স্বামী বা স্ত্রী রাজী না হইলে তাহার শাস্তি হইতে পারে।

আদর্শ, এই কথা লইয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাতৃভক্তির উহাই মূল উৎস। এই তপস্বিনীই আমাকে জগতে আনিয়াছেন, আমি আসিব বলিয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তিনি দেহ পবিত্র রাখিয়াছিলেন, মন পবিত্র রাখিয়াছিলেন, অশন, ভূষণ, চিন্তা পবিত্র রাখিয়াছিলেন—তাই ত তিনি আমার পূজ্যা। তাহার পর এই মাতৃ-ভাবের সহিত জড়িত স্ত্রীভাবের কথা উঠে।

পাশ্চাত্ত্যবাসী আপনারা বড়ই ব্যক্তি-তান্ত্রিক। আমি কেন কাজ করি? কারণ, আমার তাহা ভাল লাগে। আর সকলকে আমি উপেক্ষিত করিয়া রাখিব—কেন না এইরূপই আমার অভিরুচি। আমি অমুক রমণীকে বিবাহ করি কেন?—কারণ, উহাতেই আমি তৃপ্তি পাই, এইরূপই আমার ভাল লাগে। অমুক রমণী আমায় বিবাহ করে কেন?—কারণ, সে আমায় ভালবাসে। ইহার উপর আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সারা দুনিয়ায় আমরা দুইটি প্রাণী—আমি এবং আমার স্ত্রী; আমরা পরস্পর বিবাহ করিয়াছি, আর কাহারও তাহাতে ক্ষতি বা দায় নাই। এ ভাব-অবলম্বনে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও রমণীর সহিত অরণ্যে থাকিয়া জীবন কাটাইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে যখন সমাজে থাকিতে হয় তখন তাহাদের বিবাহের উপর আমাদের অনেক শুভাশুভ নির্ভর করে। কারণ, তাহাদের ছেলে ঠিক অসুর-প্রকৃতি, গৃহদাহী, হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, মাতাল, বদমাশ বা যে কোনও জঘন্য-প্রকৃতি হইতে পারে।

সুতরাং ভারতবাসীর সামাজিক প্রথার ভিত্তি কি? সেই ভিত্তি হইল বর্ণাশ্রম। আমার জন্ম ও জীবন, আমি যে বর্ণভুক্ত তাহার জন্য। আমি অবশ্য এখানে আমার ব্যক্তিগত কথা বলিতেছি না।

কারণ, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় আমরা বর্ণাতীত হইয়া গিয়াছি। যে যে-বর্ণে জন্মিবে সারা জীবন তাহাকে তাহার আইন মানিয়া চলিতে হইবে—অর্থাৎ, আপনাদের আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশ্চাত্ত্যে মানুষ জন্ম হইতেই ব্যক্তি-তান্ত্রিক, কিন্তু ভারতবাসী সমাজ-তান্ত্রিক—সম্পূর্ণ সোসিয়ালিষ্ট *। এখন শাস্ত্র বলেন—আমি যদি পুরুষকে যথেচ্ছ বিবাহে স্বাধীনতা দেই, তাহা হইলে ফল কি দাঁড়াইবে? ভুমি ত প্রেমে পড়িলে, কিন্তু রমণীর পিতা যদি পাগল বা যক্ষ্মারোগী হয়, তাহা ভাবিবে কে? কোন বালিকা হয়ত কোন পুরুষের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু তাহার পিতা হয়ত ঘোর মাতাল। এ বিষয়ে বিধি কি? বিধি এই—এই সব বিবাহ অবৈধ। মাতাল, যক্ষ্মারোগী বা পাগলের সন্তানের বিবাহ অসঙ্গত। শাস্ত্র বলেন—পঙ্গু, কুব্জ, বাতুল ও মূঢ়ের বিবাহ একেবারেই হইতে পারে না।

মুসলমান আসিলেন আরব দেশ হইতে তাঁহার আরব্য আইন লইয়া, তিনি তাঁহার মরুভূমির আইন আমাদের উপর চাপাইলেন। ইংরেজ আসিলেন তাঁহার আইন লইয়া, তিনি যথাশক্তি তাহা আমাদের উপর চাপাইলেন। আমরা বিজিত! আমরা আর কি করিতে পারি? আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, যতই দূর সম্পর্ক হউক, সগোত্র-বিবাহ অবৈধ। ইহাতে জাতির দৈহিক অবনতি ও বন্ধ্যাত্ব নিশ্চিত। ইহা হওয়া একেবারেই উচিত নয়, সুতরাং আমাদের শাস্ত্র ঐরূপ বিবাহ অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা দিলেন। বিবাহ বিষয়ে আমার বা আমার ভগিনীর কোন কথা চলে না। বর্ণই এই

* অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের জীবন নিজের জন্য, আর হিন্দুর জীবন সমাজের জন্য।

সকলের নিয়ন্তা। কখনও কখনও শিশুবয়সেই আমাদিগকে বিবাহ দেওয়া হও, কেন না বর্ণের নির্দ্দেশ। মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই যদি বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে প্রণয়বৃত্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্বেই বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া ভাল। যদি অল্প বয়সে বিবাহ না দিয়া ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হয়, তবে তাহারা এমন কাহারও প্রতি আসক্ত হইতে পারে, যাহাদের সহিত বিবাহ বর্ণ অনুমোদন করিবেন না, সুতরাং তাহাতে অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং বর্ণ বলেন, উহাকে গোড়াতেই থামাইতে হইবে। আমার বোন পঙ্গু, সুশ্রী বা বিশ্রী, তাহাতে কিছুই আসে যায় না ; সে আমার ভগিনী—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ভগিনীও বলে, সে আমার ভাই, ইহার বেশী আমি কিছুই জানিতে চাই না। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ হইলে, বালকবালিকার ভালবাসা রূপ-গুণের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাভাবিক হইবে। আপনারা হয়ত বলিবেন, "পরস্পরের ভালবাসায় পড়িয়া স্ত্রীপুরুষ যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করে, তাহার কিছুই ত তাহাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। অভ্যাস এবং সঙ্গ হইতে যে ভাই-বোনের ভালবাসা, ইহা ত নিতান্ত নীরস।" কিন্তু হিন্দু বলে, "হয় হউক, আমরা সমাজ-তান্ত্রিক (Socialist)। একজন স্ত্রী বা একজন পুরুষের স্ফূর্ত্তির জন্য শত শত ব্যক্তির স্কন্ধে দুঃখের বোঝা তুলিয়া দিতে পারি না।

সুতরাং এইরূপে সমাজের আদেশে অল্প বয়সে পরস্পরের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই বালকবালিকার বিবাহ দেওয়া হয়। স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে যখন আসে তখন তাহাদের দ্বিতীয় বিবাহ

হইল বলা হয়। বাল্যকালের বিবাহকে প্রথম বিবাহ বলে। তখন সে পৃথক্‌ভাবে পিতামাতা ও বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পিত্রালয়েই থাকে। যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন দ্বিতীয় বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। অতঃপর সে স্বামীর বাড়ীতে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অধীনে একত্রে বাস করে। বধূর যখন সন্তান হয় তখন তিনি গৃহিণীর পদ পান।

এইবার ভারতবাসীর একটি বিশেষ প্রথার, চিরবৈধব্যব্রতের উল্লেখ করিব। উচ্চবর্ণদ্বয়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা বিবাহ করিতে পারে না। অবশ্য ইহা অনেকের পক্ষে কষ্টকর বটে। কারণ সকল বিধবাই যে ইহা পছন্দ করে, ইহা স্বীকার করা চলে না, কেন না বৈধব্যে তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য মানিয়া চলিতে হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে মাছ, মাংস ও মদ নিষিদ্ধ। সে সাদা কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় পরিতে পারে না। আরও সব এইরূপ নিয়ম আছে। আমরা একটা সন্ন্যাসীর জাত—কেবল তপস্যাই করিয়া থাকি এবং তাহাই ভালবাসি। আমাদের মেয়েরা কখন মদ বা মাংস খায় না। ছাত্রাবস্থায় বালকের পক্ষে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য খুবই কষ্টকর বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে নয়। মাংস-খাওয়াটা মেয়েরা খারাপ বলিয়াই মনে করে। কোন কোন সম্প্রদায়ের পুরুষেরা মাংস খায় কিন্তু মেয়েরা কখনও খায় না। তথাপি বিধবাকে বিবাহ করিতে না দেওয়া যে অনেকের পক্ষে কষ্টকর, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু আমাদিগকে পুনরায় সেই পুরাতন বিষয়টির স্মরণ করিতে হইবে—হিন্দুরা পূর্ণমাত্রায় সমাজ-তান্ত্রিক।

প্রত্যেক দেশের আদম-স্থমারিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চ-বর্ণের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অনেক অধিক। কারণ উচ্চবর্ণের মেয়েরা পুরুষানুক্রমে আরামেই জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন। ছেলে বেচারীদের আর কথা কি? তাহারা ত মাছির মত মরে। ভারতবর্ষে একটা প্রবাদ আছে, "মেয়ের যেন বিড়ালের মত ন-টা প্রাণ।" আদম-স্থমারিতে দেখা যায় যে, উচ্চ-বর্ণের মেয়ের সংখ্যা অতি শীঘ্রই ছেলের সংখ্যাকে ছাপাইয়া যায়, কেবল আজকাল তাহারা ছেলেদের মত পরিশ্রম করায় উহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। নিম্নবর্ণাপেক্ষা উচ্চবর্ণে মেয়ের সংখ্যা অনেক অধিক। কারণ নিম্নবর্ণের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের সকলেই কঠোর শ্রম করে এবং অনেক সময় মেয়েদের একটু বেশীই খাটিতে হয়, কারণ গৃহস্থালির কাজ তাহাদেরই হাতে। ভারতের নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকদের অপেক্ষাকৃত বেশী খাটিতে হয় সত্য, তবে পাশ্চাত্ত্য দেশের কোন কোন স্থানের গরীব মেয়েদের তুলনায় তাহাদের জীবন অপেক্ষাকৃত আরামের। আমেরিকান্ পরিব্রাজক মার্ক টোয়েনের ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ হিন্দুদের রীতিনীতি সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, সেখানে কিন্তু আমি ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশের ন্যায় তাহাদের নারীকে হালের গরু অথবা গাড়ীটানা কুকুরের সহিত জুড়িয়া দিতে দেখি নাই। ভারতে আমি কখন কোনও রমণী বা বালিকাকে চাষের কাজ করিতে দেখি নাই। রেলের হু'ধারে এবং সামনে দেখা যায় শ্যামবর্ণ পুরুষ ও ছেলেরা খালি গায়ে চাষ দিতেছে, কিন্তু একটিও

স্ত্রীলোক দেখা যায় না ; এই দুই ঘণ্টা যাবৎ আমি কোনও স্ত্রীলোক বা বালিকাকে মাঠে কাজ করিতে দেখি নাই।" ভারতে নিম্নতম জাতির মেয়েরা পর্য্যন্ত কখনও খুব কঠোর পরিশ্রম করে না। অপর দেশের নিম্নজাতির তুলনায় ভারতের ঐ শ্রেণীর মেয়েদের কাজ অনেক সহজ। চাষবাস ত তাহারা একেবারেই করে না। তথাপি উচ্চবর্ণের মেয়েদের তুলনায় তাহাদের কঠোর জীবন। এইবার বুঝিলেন ত! পূর্ব্বোক্ত কারণে ভারতে নিম্নশ্রেণীর নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। ফলে দাঁড়ায়, পুরুষের সংখ্যা বেশী হওয়ায় স্ত্রীলোকেরা বিবাহের সুযোগ অধিক পায়।

বিধবাদের বিবাহ না হওয়া সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রথম দুই বর্ণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে অত্যধিক। কাজেকাজেই উভয় সঙ্কট। একদিকে পুরুষের সংখ্যা কম হওয়ায় বিধবার জন্য স্বামী পাওয়া কঠিন, সুতরাং বিধবার কষ্ট, অপরদিকে কুমারীর স্বামি-সমস্যা। এখন তোমার সম্মুখে বিধবা-বিবাহ বা কুমারী-বিবাহরূপ দুইটি সমস্যার মধ্যে অন্যতমটি আসিয়া পড়িবেই। এখন সেই পুরাতন কথাটি আবার স্মরণ কর, ভারতীয় মন সমাজ-তান্ত্রিক। তাহারা বলে, "দেখুন কুমারী-সমস্যার তুলনায় বিধবা-সমস্যা গৌণ ব্যাপার।"—কেন? কারণ, তাহারা একবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা বিবাহিতা হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে তাহারা সেই সুযোগ পাইয়াও উহা হারাইল বটে, কিন্তু একবার ত তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। তাহার পর স্থিরভাবে একবার কুমারী বেচারীদের কথা চিন্তা কর দেখি। তাহারা ত বিবাহের একটিও সুযোগ পায় নাই। একদিনের

একটা ব্যাপার আমার মনে আছে; অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে দশটার পর হাজার হাজার মেয়েদের বাজার করিতে আসিতে দেখিয়া একজন আমেরিকান্ বলিয়া উঠিল, 'বাবা, এদের বর জুটিবে কি করিয়া তাই ভাবি।' সেইজন্য ভারতীয়েরা বিধবাদের বলে, 'তোমরা ত একবার সুযোগ পাইয়াছ। তোমাদের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আমরা বাস্তবিক ব্যথিত। কিন্তু কোনও উপায় ত নাই। এখন অন্য মেয়েরা (কুমারীরা) বিবাহের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে।'

এবার এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম কি বলেন দেখা যাক। ধর্ম্ম আসিলেন সান্তনা লইয়া। একটা কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—বিবাহ জিনিসটা খারাপ, উহা শুধু দুর্ব্বলের জন্য। যাহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, তাহারা কখনও বিবাহ করে না—তা স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক। ধার্ম্মিক স্ত্রীলোক বলেন, "ভগবান ত আমাকে উহা অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ দিয়াছেন। বিবাহ করিয়া কি হইবে? ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা করি, মানুষকে ভালবাসিয়া কি হইবে?" অবশ্য সকলেই ভগবানে মন সমর্পণ করিতে পারে না। কাহারও কাহারও পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব এবং সেইজন্য তাহাদের কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেচারীরা তাহাদের জন্য কষ্ট পাইবে কেন? এখন আপনারা বিচার করুন। ভারতবর্ষের ধারণা কিন্তু এই।

এইবার আমরা নারীর কন্যাবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। হিন্দু পরিবারের কন্যাকে লইয়াই যত মুশকিল। কন্যা এবং বর্ণ এই দুইটি হিন্দুর সর্ব্বনাশ করে; কারণ, তাহাকে একই বর্ণে এবং উহার

মধ্যে আবার উপযুক্ত কুলে বিবাহ দিতে হইবে। সুতরাং মেয়েকে বিবাহ দিবার জন্য বাপকে অনেক সময় ভিখারী হইতে হয়। বরের বাপ সুযোগ বুঝিয়া এমন উচ্চ পণ হাঁকেন যে, মেয়ের বর যোগাড় করিতে কন্যার পিতাকে অনেক সময় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। হিন্দুর জীবনে কন্যা লইয়াই যত সমস্যা। আর একটা বিষয় আপনারা লক্ষ্য করিবেন, সংস্কৃতে কন্যাকে দুহিতা বলে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এই—পুরাকালে পরিবারে কন্যাই গোদোহন করিত, সুতরাং দোহার্থক 'দুহ্' ধাতু হইতে 'দুহিতা' শব্দ আসিয়াছে, এবং দুহিতা শব্দে প্রকৃতপক্ষে 'গোদোহনকারিণী'ই বুঝায়। কিন্তু পরে 'গোদোহনকারিণী দুহিতা' শব্দের আর এক নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল। উহার দ্বিতীয় অর্থ হইল, যে পরিবারের সকল সার পদার্থ দোহন করিয়া লয়।

সমাজে ভারতীয় নারীর এই হইল বিভিন্ন সম্পর্ক। আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, মায়ের আসন সর্ব্বোচ্চ, তারপর স্ত্রীর, তারপর দুহিতার। এই সব শ্রেণীক্রম বড়ই জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য। বহু বৎসর সে দেশে বাস করিলেও বিদেশীর তাহা বোধগম্য হওয়া বড় কঠিন। উদাহরণস্বরূপ—যেমন আমাদের সম্বোধন-বাচক সর্ব্বনামের তিনটি রূপ আছে। ইহার একটি 'আপনি' খুব সম্মানসূচক, আর একটি 'তুমি' মাঝামাঝি এবং সব চেয়ে নীচেরটি 'তুই' ঠিক ইংরেজীর 'দাউ' (thou) এবং 'দী'র (thee) মত। ছেলেপুলে এবং ঝি-চাকরের প্রতি সব শেষেরটি 'তুই' এবং সমান পদবীর লোকের প্রতি দ্বিতীয়টির 'তুমি' ব্যবহার হয়। জীবনের বিবিধ জটিল সম্পর্কের অনুযায়ী

এগুলির ব্যবহার করিতে হয়। যেমন আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আমি সারাজীবন ধরিয়াই 'আপনি' বলি, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলিবার সময় তিনি তাহা করেন না, তিনি বলেন 'তুমি'। তিনি কখনও 'আপনি' বলিতে পারেন না, কারণ তাহাতে আমার অকল্যাণ হইবে। গুরুজনের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা ঐরূপ ভাষায়ই প্রকাশ করিতে হয়। ইহাই রীতি। এইরূপ 'তু', 'তুম্' বা 'তুমি' বলিয়া মা ও বাপকে ত নয়ই, দাদা বা দিদিকেও ডাকিতে সাহস করি না। বাপ-মাকে নাম ধরিয়া ডাকা!—সে আবার কি? আমরা তা কখনও ডাকি না। আমি যখন এ দেশের প্রথা জানিতাম না, তখন একদিন একটি বিশিষ্ট ঘরের ছেলেকে মায়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, এখন আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এ দেশের প্রথা এইরূপ। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা বাপ-মার সামনে কখনও তাঁহাদের নাম ধরি না।

এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক জীবন এবং সম্বন্ধের তারতম্য কিরূপ জালের মত জটিল। আমরা গুরুজনদের সাক্ষাতে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি না, শুধু ছোটদের সামনে অথবা নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা চলে। যদি আমি বিবাহিত হইতাম তাহা হইলে কেবল ছোট বোন, ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ীর সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিতাম। ভগ্নীর সহিত তাহার স্বামীর সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তাই বলা চলে না। কথাটা হইল, আমরা সন্ন্যাসীর জাত, সমস্ত সমাজ-সঙ্ঘের সামনে ঐ এক ধারণাই নিরন্তর খেলিতেছে। বিবাহটাকে কতকটা অপবিত্র

কতকটা নীচু বলিয়া লোকের ধারণা। সেইজন্য প্রণয়-ব্যাপার লইয়া কোনও কথাবার্ত্তা চলে না। এমন কি, একখানা উপন্যাস পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠ ভাই, ভগ্নী, মা বা অপর কোনও গুরুজনের নিকট পড়া চলে না, উঁহাদের কেহ সামনে আসিলেই উহা বন্ধ করিতে হইবে।

তারপর পান-ভোজন পর্য্যন্তও ঐ একই পর্য্যায়ে পড়ে। গুরুজনের সামনে আমরা খাই না। স্ত্রীলোকেরা ছেলেপুলে বা কোনও ছোট সম্পর্ক ছাড়া পুরুষের সামনে কখনও খায় না। নারীরা বলে, স্বামীর সামনে কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়ার চাইতে মরণ ভাল। কখনও কখনও ভাই-বোনে একসঙ্গে খাওয়া চলে। ধরুন, আমি ও আমার ভগ্নী একসঙ্গে খাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ তাহার স্বামী দরজায় দাঁড়াইল, অমনি সে খাওয়া বন্ধ করিবে এবং স্বামী বেচারীও তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে।

এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রথা সে দেশের; ইহাদের কয়েকটি আমি অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করিয়াছি। আমি বিবাহিত নহি বলিয়া স্ত্রী-সম্পর্কীয় সকল ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে জানি না। মা-বোনের বিষয় আমি জানি; অপরের স্ত্রী-সম্বন্ধে আমি কতকটা দেখিয়াছি মাত্র; ইহা হইতেই সংগ্রহ করিয়া আমি যাহা কিছু আপনাদের বলিতেছি।

শিক্ষা ও কৃষ্টি (culture) পুরুষদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা উচ্চশিক্ষিত, স্ত্রীলোকেরাও সেখানে উচ্চশিক্ষিতা। পরন্তু পুরুষেরা শিক্ষিত না হইলে স্ত্রীলোকেরাও হয় না। হিন্দু প্রাচীন রীতিনীতি অনুযায়ী পুরাকাল হইতে জমি-জমা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে; অর্থাৎ

আপনাদের ভাষায় উহা সরকারের। জমিতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্ব নাই। ভারতের রাজস্ব জমির খাজনা হইতেই আসে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি সরকার হইতেই জমি পায়। এই জমি পাঁচ, দশ, কুড়ি অথবা একশত পরিবারের সাধারণ সম্পত্তি ভাবে থাকে। তাহারা সমস্ত জমি শাসন করে, রাজস্ব দেয়, গ্রামের বৈদ্য পণ্ডিত প্রভৃতির সংস্থান করে।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের বই পড়িয়াছেন তাঁহারা মঠ-প্রথায় শিক্ষা (monastery system of education) কি তাহা জানেন। ইহা এক সময়ে ইউরোপে পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে ইহার দ্বারা বেশ সুফলও হইয়াছিল। এই প্রথানুসারে একজন পণ্ডিতের অধীনে একটি স্কুল থাকে এবং গ্রামের লোকেরা তাহার খরচ বহন করে। এই পাঠশালাগুলি খুব মোটামুটিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। আমাদের শিক্ষার উপায়গুলি বড়ই সরল, প্রত্যেক ছাত্রকে বসিবার জন্য একখানি করিয়া ছোট মাদুর আনিতে হয়, আর লিখিবার কাগজ হয় প্রথমে তালপাতা, কারণ তাহাদের পক্ষে কাগজের দাম খুব বেশী। প্রত্যেক ছাত্র মাদুর বিছাইয়া বসিয়া নিজের দোয়াত ও পুঁথি বাহির করিয়া লেখা আরম্ভ করে। পাঠশালায় একটু অঙ্ক, একটু-আধটু সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সামান্য ভাষাও শিক্ষা দেয়।

একজন বৃদ্ধের লেখা নীতি-শিক্ষা আমাদের মুখস্থ করিতে হইত। ইহার খানিকটা ভাব আমার মনে আছে—

গ্রামের কল্যাণের জন্য পরিবার ত্যাগ করিবে ;
দেশের কল্যাণের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিবে ;

মানুষের কল্যাণের জন্য দেশ ত্যাগ করিবে;
বিশ্বের কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে।

পুঁথিগুলিতে এইরূপ সব কবিতা আছে, সেগুলি আমাদের মুখস্থ করিতে হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে হয়। বালক-বালিকারা এইগুলি এক সঙ্গেই শিখে, পরে শিক্ষার বিভিন্নতা হয়। প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ বালকদের লইয়াই গঠিত ছিল। বালিকারা কদাচিৎ সেই সকল বিদ্যালয়ে যাইত। তবে দুইটি একটি ব্যতিক্রমও দেখা যাইত।

আজকাল ভারতে পাশ্চাত্ত্যভাবে শিক্ষার প্রতি খুব বেশী ঝোঁক এবং স্ত্রীলোকেরও ঐ উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সাধারণের খুব আগ্রহ। অবশ্য কতক লোক উহা চায় না। কিন্তু যাহারা চায় তাহাদেরই জয় হইয়াছে। এটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, অদ্যাপি স্ত্রীলোকেরা অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজে প্রবেশ করিতে পারে না। হার্ভার্ড ও ইয়েলেও তদ্রূপ। কিন্তু বিশ বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার স্ত্রীলোকদের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আমার স্মরণ আছে যে, আমি যেবার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেবার অনেকগুলি বালিকাও পরীক্ষা দিয়া বি-এ উপাধি পাইয়াছিল। তাহাদের পাঠ্য পুস্তক ও অন্যান্য বিষয় বালকদেরই অনুরূপ ছিল এবং তাহাদিগকে একইরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইয়াছিল এবং তাহারা কৃতিত্বও দেখাইয়াছিল বেশ। আমাদের ধর্ম্ম স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মোটেই বাধা দেয় না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ।" ঠিক এইভাবে বালিকাদেরও পালিতা এবং শিক্ষিতা হওয়া উচিত। প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে বালক এবং বালিকা

উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সমস্ত জাতির শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিদেশী শাসনের অধীনে আর কি আশা করা যাইতে পারে? বিদেশী শাসকেরা টাকা চায়। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহারা আসে নাই। দ্বাদশ বর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়া আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেজুয়েট হই, কিন্তু আমার দেশে আমি বোধ হয় মাসে কুড়ি টাকাও রোজগার করিতে পারি না; ইহা কি আপনাদের বিশ্বাস হয়? কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা। বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প টাকায় বেশী কাজ-কর্ম্ম করিতে পারে এমন কতকগুলি গোলামের সৃষ্টি করিতেছে—যেমন কেরাণী, পোষ্টমাষ্টার, টেলিগ্রাফমাষ্টার ইত্যাদি। এই হইল অবস্থা।

ফলে বালক-বালিকার শিক্ষা একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সে দেশে অনেক কিছু করিবার আছে। আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি আপনাদেরই একটি চলিত কথা দ্বারা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে 'হংসীর পক্ষে যাহা সুখাদ্য, হংসের পক্ষেও তাই।' বিদেশী মহিলারা ভারতীয় স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু হিন্দু-পুরুষের বিষয় তাঁহারা আমলই দেন না। তাঁহারা কেবল বালিকাদের জন্য শোকাশ্রুপাত করেন, কিন্তু বালিকাদের বিবাহ করে কাহারা? একজনকে বলা হইয়াছিল যে হিন্দু-বালিকাদের বুড়ো বরের সহিত বিবাহ হয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবকেরা তবে কি করে? বালিকাদের শুধু বৃদ্ধদের সহিতই বিবাহ হয় একি কথা!" আমরা আজন্ম বৃদ্ধ—বোধ হয় সে দেশের সকলেই বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ভারতের আদর্শ আত্মার মুক্তি। এ জগৎটা কিছুই নয়—একটা কল্পনা, একটা স্বপ্ন। আমাদের বর্ত্তমান জীবন ইহারই অনুরূপ লক্ষ লক্ষ জন্মের একটি মাত্র। এই সমস্ত প্রকৃতিই একটা মায়া, একটা প্রহেলিকা—একটা ভ্রান্তি-ব্যাধির আকর। ইহাই হইল আমাদের দর্শন। শিশুরাই জীবন দেখিয়া হাসে এবং ভাবে ইহা কত সুন্দর এবং মঙ্গলময়; কিন্তু কয়েক বর্ষ পরে আবার তাহাদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল, আবার কাঁদিতে কাঁদিতেই যাইবে। একটা জাতি তাহার যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভাবে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, তাহারা ভাবে 'আমরা পৃথিবীর দেবতা, আমরা ভগবানের চিহ্নিত লোক।' তাহারা ভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান তাহাদের জগৎশাসন করিবার সনদ দিয়াছেন, ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় তাহারা পূরণ করিতেছে, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে; জগৎকে তাহারা ওলটপালট করিয়া দিতে পারে; লুট-তরাজ করিবার, হত্যা করিবার, ধ্বংস করিবার সনদ তাহাদের আছে; ভগবানের নিকট তাহারা সনদ প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা শিশু বলিয়াই ঐরূপ ভাবে। কত সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য উঠিল, উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত হইল, তাহার পর কোথায় মিশাইয়া গেল, তাহা কে জানে? হয়ত রহিয়া গেল একটা বিরাট ধ্বংসের স্তূপ।

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।"

যেমন পদ্মপাতার জল-বিন্দু যে কোনও মুহূর্ত্তে গড়াইয়া যাইতে পারে—এই মর্ত্ত্য জীবনও ঠিক তেমনি। যে দিকেই তাকাই

সেই দিকেই দেখি ধ্বংস। আজ যেখানে দেখিতেছি অরণ্য, কালে ছিল সেখানে নগর-নগরীশোভিত বিরাট সাম্রাজ্য। এই হইল ভারতীয় চিন্তার বিশিষ্ট ভাব-ধারা ও প্রকৃতি। আমরা জানি যৌবনের রক্ত-প্রবাহ আজ পাশ্চাত্ত্যের ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা জানি মানুষের মত জাতিরও একটা দিন আছে। কিন্তু কোথায় এখন গ্রীস? কোথায় রোম? সেদিনকার শক্তিশালী কোথায় সেই স্পেন? আবার কে জানে, এই অবস্থার মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষেরই বা কি হইবে! জাতি এমনি করিয়াই জন্মায়, আবার এমনি করিয়াই মরে, এমনি করিয়াই তাহাদের উত্থান, আবার এমনি করিয়াই তাহাদের পতন। যে মোগল-বাহিনীর প্রতিরোধকারী শক্তি জগতে ছিল না, যাহারা আপনাদের ভাষায় ভয়াবহ 'তাতার' শব্দটি রাখিয়া গিয়াছে, সেই মোগল-পরাক্রমের শৈশবকাল হইতেই হিন্দুজাতি তাহার সহিত পরিচিত। হিন্দু যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। সে ইদানীন্তন শিশুদের মত আবোল-তাবোল বকিতে চায় না। হে পাশ্চাত্ত্যবাসিগণ, আপনাদের যাহা প্রাণ চায় বলুন—এখন আপনাদেরই দিন পড়িয়াছে। আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাই আমরা চুপ। আপনাদের আজকাল কিছু ঐশ্বর্য্য হইয়াছে বলিয়া আপনারা আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এখন আপনাদেরই দিন। 'বক'-শিশু বক—এই হইল হিন্দুর মনোভাব।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

*　　*　　*

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"

মেলা বাজে কথা দিয়া প্রভুকে পাওয়া যায় না। ধীশক্তির দ্বারাও প্রভুকে পাওয়া যায় না। বিজয়িনী শক্তির দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি বিশ্বের মূল-রহস্য জানেন এবং তদ্ভিন্ন সবই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট প্রভু আসেন, অন্যত্র নয়। যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া হিন্দু তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এখন ভগবানের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। অবশ্য সে অনেক ভুল করিয়াছে, বস্তার পর বস্তা আবর্জ্জনা তাহার জাতির উপর স্তূপাকার রহিয়াছে। কিন্তু তবুও তাহাতে আসিয়া গেল কি? আবর্জ্জনা ও শহর-পরিষ্কারের মধ্যে আছে কি? উহা কি জীবন দিতে পারে? যে জাতির মধ্যে সুন্দর প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাকেও ত মৃত্যু-কবলিত হইতে হয়। তখন এই চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কথা আর কি বলিব! পাঁচ দিনে তৈয়ারী হইয়া ষষ্ঠ দিনে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এই মুষ্টিমেয় জাতিগুলির একটিও একাদিক্রমে দুই শতাব্দী বাঁচিতে পারে না। পরন্তু আমাদের জাতির প্রথাসমূহ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। হিন্দুরা বলেন, আমরা পৃথিবীর যাবতীয় বৃদ্ধ জাতিদের সমাহিত করিয়াছি এবং নূতন জাতিদের সমাহিত করিবার জন্য এখনও দাঁড়াইয়া আছি। কারণ আমাদের আদর্শ এই জগৎ নহে, জগদতীত। 'যাহার যেমন আদর্শ সে তাহাই হয়'—তোমার আদর্শ যদি মর্ত্ত্য হয়, পার্থিব হয়, তুমি তাহাই হইবে। তোমার আদর্শ যদি জড় হয়, তুমি তাহাই হইবে। মনে রাখিও আমাদের আদর্শ আত্মা। তিনিই একমাত্র অবিনাশী—আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, তাঁহারই মতন আমরা অমৃত।

হিন্দু-নারীর আদর্শ

হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।

হিন্দু-নারীর আদর্শ

ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ—স্ত্রী অপেক্ষাও তাঁহার স্থান উচ্চে। স্ত্রী পুত্র হয়ত কখনও পুরুষকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু মা কখনও করিতে পারেন না। সে অবস্থায়ও মায়ের ভালবাসা একই রূপ থাকে এবং হয়ত একটু বৰ্দ্ধিতই হয়। মায়ের ভালবাসার জোয়ার-ভাঁটা নাই, কেনা-বেচা নাই, জরা-মরণ নাই। মায়েরই শুধু এরূপ ভালবাসা থাকা সম্ভব—পুত্রকন্যার নহে বা স্ত্রীরও নহে।

মাতৃপদই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ, কারণ উহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপর শিক্ষা, নিঃস্বার্থপর কার্য্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবৎপ্রেমই কেবল মায়ের ভালবাসা হইতে উচ্চতর, আর সবই নিম্নশ্রেণীর। মাতার কর্ত্তব্য—প্রথম ছেলেদের বিষয় ভাবা, তাহার পর নিজের বিষয়। তাহা না করিয়া যদি বাপ মা সর্ব্বদা সামান্য খাবার-দাবার-বিষয়ে পর্য্যন্ত প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন, নিজেই ভাল অংশটুকু লন, ছেলেরা পাইল কি না পাইল সে দিকে দৃষ্টি না রাখেন, তবে ফলে এই হয় যে, বাপ-মা ও ছেলেদের ভিতর সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখী আর পাখীর ছানার সম্বন্ধের মত। পাখীর ছানাদের ডানা উঠিলে তাহারা আর বাপ-মা মানে না। সেই পুরুষ বাস্তবিক ধন্য, যে স্ত্রীলোককে ভগবানের মাতৃ-ভাবের প্রতিমূৰ্ত্তি বলিয়া দেখিতে সক্ষম। সেই স্ত্রীলোকও ধন্য, যিনি মানুষকে ভগবানের পিতৃভাবের প্রতিমূৰ্ত্তিরূপে দেখিতে পারেন। সেই

সন্তানেরাও ধন্য, যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে ভগবানের প্রকাশ-রূপে দেখিতে সক্ষম হয়।

শাক্তেরা জগতের সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন—কারণ মা নামের অপেক্ষা মিষ্ট নাম আর কিছু নাই। ভারতে মাতাই স্ত্রীচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

জননী শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ, আর জনকের ধারণা হইতে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হইয়া থাকে। মা নাম করিলেই শক্তির ভাব, সর্ব্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব আসিয়া থাকে। শিশু আপনার মাকে সর্ব্বশক্তিময়ী মনে করে। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রহিয়াছে, তাহারই উপাসনাতে মহত্ত্বলাভ হয়।

প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর। প্রত্যেক স্বামী নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর স্ত্রীলোককে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচার্য্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের উপর মাতৃভাব অবলম্বন করা এবং তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত।

শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকল দেশের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—এখানে শক্তির অবমাননা বলিয়া। শক্তির কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না। আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখিয়াছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু ইহারা না জানিয়া পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যাহারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করিবে, তাহাদের কি কল্যাণ না হইবে!

আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে যে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি সাধারণতঃ উহা নারীর সৌন্দর্য্য ও যৌবনের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন, সকল নারী সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত কিছুই নহেন—তাঁহারই পূজা। আমি নিজে দেখিয়াছি—সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এইরূপ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পতিত হইয়া অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বলিতেছেন, "মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি, মা আমি তোমাকে প্রণাম করি।" ভাবিয়া দেখ, সেই জীবন কিরূপ ধন্য, যাহা হইতে সর্ব্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কেবল সেই আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তোমরা কি বলিতে চাও, রমণীর মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকে ঠকাইতে পারা যায়? তাহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উহা সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় জুয়াচুরি, কপটতা ধরিয়া ফেলে, তাহা অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আবশ্যক।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা, তাঁহারা নিজেরা যেরূপ গর্ব্ব করেন, যদি ততদূর পবিত্র ও সৎ হইতেন (বিদেশী লোক ঐরূপ শুনিয়া

তাঁহাদিগকে খুব পবিত্র ও সৎ বলিয়াই বিশ্বাস করে), তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ওদেশে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। মানুষ কাহাকে লইয়া অপবিত্র হইবে? এমন পাশব ভাব কী আছে, পবিত্রতা ও সতীত্ব যাহা জয় করিতে না পারে? যে কল্যাণী সতী স্ত্রী নিজ স্বামী ব্যতীত সকলকেই তাঁহার ছেলের মত দেখেন, আর সকল লোকের প্রতিই জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতাশক্তিতে এতদূর উন্নত হন যে এমন পশুপ্রকৃতির লোক নাই, যে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া না অনুভব করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম; আর এমন মানুষ পাওয়া দুর্ঘট (সে যতদূর মন্দ হইয়াই যাউক না কেন), নম্রা প্রেমিকা সতী যাহাকে ফিরাইয়া সৎপথে না আনিতে পারে। জগৎ এখনও এতদূর মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমি নৃশংস পতি ও পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই, নৃশংসা ও অপবিত্রা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও পুরুষের সংখ্যার অনুরূপ।

আমার একটি স্ত্রীলোকের কথা মনে হইতেছে—তাহার স্বামী ছিল ঘোর মাতাল। স্ত্রীলোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত পানদোষ সম্বন্ধে অভিযোগ করিত। আমার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা—অধিকাংশ লোক তাহাদের স্ত্রীর দোষে মাতাল হইয়া থাকে। তোষামোদ করা আমার কার্য্য নহে, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে-সকল অবাধ্য রমণীগণের মন হইতে সহ্যগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকে যে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুষ্টির ভিতর রাখিবে, আর যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া

তাহাদের অরুচিকর কথা বলিয়া থাকে, তখনই চীৎকার করিতে থাকে—এরূপ রমণীগণ জগতের মহা অকল্যাণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে; আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্দ্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রেম কর্ত্তব্য-চক্রকে স্নেহসিক্ত করিলেই উহা বেশ মসৃণভাবে চলিতে থাকে। নতুবা ক্রমাগত ঘর্ষণ।—কোন্ স্বামী স্ত্রীর প্রতি, আর কোন্ স্ত্রীই বা স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে? আমরা কি আমাদের জীবনে প্রতিদিনই ক্রমাগত সংঘর্ষ দেখিতেছি না? প্রেমার্দ্র হইলেই কর্ত্তব্য মধুর হয়। প্রেম আবার স্বাধীনতাতেই দীপ্ত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষার দাস এবং শত শত ছোট ছোট দৈনন্দিন সাংসারিক ঘটনার দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা? আমরা জীবনে যত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কশভাব প্রত্যক্ষ করি, ঐগুলিতে সহিষ্ণুতা-অবলম্বনই স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ অভিব্যক্তি। স্ত্রীলোকেরা সহজে নিজেদের উত্তেজিত, ঈর্ষাপূর্ণ করিয়া মেজাজের দাস হইয়া তাহাদের স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা বলে এবং মনে করে—আমরা স্বাধীন; কিন্তু জানে না যে তাহারা এইরূপে আপনাদিগকে প্রতি পদে দাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে! যে-সকল স্বামী সর্ব্বদাই তাহাদের স্ত্রীর দোষ দেখিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও একই কথা।

যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সে আর আপনি আপনার প্রভু থাকে না, সে দাস হইয়া যায়। যদি কোন রমণী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে সেই পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে।

পুরুষও তদ্রূপ রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার ত কোন প্রয়োজন নাই।

যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ তাহাই একমাত্র প্রেম-শব্দ-বাচ্য। সকল রমণীই বলিয়া থাকে তাহারা ভালবাসে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই বেশ বুঝিতে পারে, তাহারা ভালবাসিতে অক্ষম। সংসারে ভালবাসার কথা খুব শুনা যায়, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে তাহা তুমি কিরূপে জানিবে? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ, উহাতে কেনা-বেচা নাই। এক ব্যক্তি যখন অপরকে তাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার জন্য ভালবাসে, জানিবেন সে ভালবাসা নহে, দোকানদারী। যেখানে কেনা-বেচার কথা, সেখানে প্রেম নাই। প্রেম চিরকাল দানই করে, সে চিরকালই দাতা—গ্রহীতা কোনকালেই নহে।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ, প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। কাহাকেও ভয় দেখাইয়া কি ভালবাসান যায়? ভালবাসা থাকিলে কখনও ভয়ের ভাব থাকিতে পারে না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন কার্য্যাবসানে গৃহে আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কিভাবে দেখিয়া থাকেন? তিনি তাঁহাকে তাঁহার স্বামী বলিয়া, তাঁহার প্রেমাস্পদ বলিয়াই দেখিয়া থাকেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর। প্রেম সর্ব্বদাই উচ্চতম আদর্শস্বরূপ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করিয়া যায়, তখন সে দোকানদারী ও ভয়ের ভাব ত্যাগ করে, তখন সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে প্রেমই সর্ব্বদা আমাদের উচ্চতম আদর্শ।

প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র নাই, কারণ উহাই প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায় ততদিন প্রকৃত প্রেম আসিতে পারে না। হইতে পারে অনেক স্থলে মানুষের প্রেম মন্দ দিকে প্রযুক্ত হয়; কিন্তু প্রেমিক লোকের পক্ষে তাহার প্রিয় বস্তুই তাহার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। কোন ব্যক্তি অতি কুৎসিত লোকের ভিতর আপনার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায়, আবার অপরে উহা খুব ভাল লোকে দেখিতে পায়; কিন্তু সকল স্থলে আদর্শটিকেই কেবল প্রকৃত গভীররূপে আমরা ভালবাসিয়া থাকি।

আমরা এই জগতে অনেক সময় দেখিতে পাই যে, পরমা সুন্দরী রমণী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, পরম সুন্দর পুরুষ অতি কুৎসিতা রমণীকে ভালবাসিতেছে। তাহারা কিসে আকৃষ্ট হইতেছে? বাহিরের লোকে সেই স্ত্রী বা পুরুষকে কুৎসিত বলিয়াই দেখিবে, কিন্তু প্রেমিক তাহা কখনও দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। ইহা কিরূপে হয়? যে রমণী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে, সে যেন তাহার নিজ মনের আভ্যন্তরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যের আদর্শ লইয়া ঐ কুৎসিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করিতেছে, আর সে যে সেই কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নহে, সে তাহার নিজের আদর্শের পূজা করিতেছে।

"কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন তাঁহার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে;

পত্নীর জন্য কেহ পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার জন্যই লোকে পত্নীকে ভালবাসে; কেহই সেই সেই বস্তুর জন্য, সেই সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই সেই বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে।” এমন কি এই স্বার্থপরতা, যাহাকে লোকে এত নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাও সেই প্রেমেরই এক প্রকাশ মাত্র। ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায়, ঐ ‘স্ব’-এর, ঐ ‘অহং’-এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটিতেছে। সেই এক ‘অহং’-লোক বিবাহিত হইলে দুইটা হইল, ছেলেপুলে হইলে অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার অহং-এর বিস্তৃতি দেখা যায়। অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্ব্বজনীন প্রেম, অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

মহাশক্তি আমাদের পশ্চাদ্দেশ হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন—আমরা জানি না কোথায় সেই প্রেমাস্পদকে খুঁজিব—কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সর্ব্বোচ্চ, স্পষ্টাভিব্যক্ত, প্রবল ও মনোহর। স্ত্রী-পুরুষের এই প্রমত্ত ভালবাসা সাধু-মহাপুরুষগণের প্রেমোন্মাদেরই ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র।

শাস্ত্র বলেন, জগতে একমাত্র আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। পতির পরম অনুরাগিণী রমণী জানে না যে, তাহার পতির মধ্যে যে মহা-আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে তাহাই তাহাকে তাহার স্বামীর দিকে টানিতেছে।

তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র কোন মর্ত্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র খানিকটা মৃৎখণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবে যদি সে ভাবে—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবে, যদি সে জানিতে পারে—স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপা। তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে বর্ত্তমান। তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমার ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে।

পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসা দ্বারা প্রীত করিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।

যদি স্ত্রী আমাদিগকে ঈশ্বরপথে সহায়তা করে, তবে তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়। সতীত্বই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্যেই প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে?

জাতির জীবনে পূর্ণব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র ও বিচ্ছেদহীন করিতে হইবে এবং তাহারই সাহায্যে মাতৃপূজার উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে। রোম্যান-ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করিয়া বহু শক্তিশালী স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরবদের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি, একটা বলপূর্ব্বক অধিকারমাত্র—উহা

ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ পাই না। বৌদ্ধধর্ম্ম এমন কতকগুলি জাতির মধ্যে পড়িয়াছে, যাহাদের সমাজে এখনও বিবাহপ্রথার অভিব্যক্তি হয় নাই, সুতরাং ঐ সব দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নামে সন্ন্যাসের প্রহসন চলিতেছে। তোমাদের যেমন ধারণা যে ব্রহ্মচর্য্যই জীবনের পরম গৌরব, আমারও তেমনি এই একটি বিষয়ে চোখ খুলিয়া গিয়াছে যে, ঐরূপ শক্তিশালী আকুমার ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর সৃষ্টির জন্য সর্ব্বসাধারণের বৈবাহিক জীবনকে পুণ্যময় করিয়া তোলা আবশ্যক।

বিবাহ সম্বন্ধে ভারত ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ ভিন্ন। পাশ্চাত্ত্যে বিবাহ বলিতে শুধু আইনের বন্ধন, ইহকালের যাহা কিছু তাহাই বুঝায়। ভারতের দৃষ্টিতে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ ঘটাইবার একটা সামাজিক ব্যবস্থা। তাহাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাহারা পরস্পরকে স্বামিস্ত্রীরূপে পাইবেই। তাহাদের প্রত্যেকেই অপরের অর্দ্ধেক পুণ্যের ভাগী। যদি তাহাদের কেহ জীবনে অত্যধিক পিছাইয়া পড়ে, তবে সেই স্ত্রী বা স্বামী যতদিন পর্য্যন্ত তাহার সহধর্ম্মী বা সহধর্ম্মিণীর সমকক্ষ না হইতেছে, ততদিন অগ্রগামীর পক্ষে অপেক্ষা করিয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই।

স্ত্রী হইলেন হিন্দুর সহধর্ম্মিণী। হিন্দুকে শত শত ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, কিন্তু স্ত্রী না থাকিলে একটিও হয় না। পুরোহিত তাহাদের উভয়কে একসঙ্গে বাঁধিয়া দেন এবং পরস্পরের সহিত আবদ্ধাবস্থায়ই তাহারা দেবমন্দির-প্রদক্ষিণ ও তীর্থদর্শন করিয়া থাকে।

হিন্দু-নারীর আদর্শ

ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত সীতা তাহার আদর্শ। রমণী-চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতার চরিত্রে কেন্দ্রীভূত; আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ, সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই সাধ্বী, সেই সদা-বিশুদ্ধ-স্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা নরলোকের, এমন কি দেবলোকের পর্য্যন্ত আদর্শভূতা, মহনীয়-চরিত্রা। সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্ত্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক করে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের বেদ পর্য্যন্ত লোপ পাইতে পারে—আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্য-ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা চলিতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদের

উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

ভারতের বালক-বালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা —পরম-বিশুদ্ধ-স্বভাবা, পতি-পরায়ণা, সর্ব্বংসহা সীতার ন্যায় হওয়া! এই সমুদয় চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর বিভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশ বলেন— কর্ম্ম কর, কর্ম্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। ভারত বলেন— দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্ত্য দেশ সেই সমস্যার পূরণ করিয়াছেন; ভারতে এদিকে মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে এই সমস্যার পূরণ করিয়াছেন। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি-স্বরূপা, যেন মূর্ত্তিমতী ভারত-মাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কি না, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না। কিন্তু আমরা জানি সীতা-চরিত্রে যে আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্ত্তমান। সীতা-চরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে, সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহা প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যান তেমন করে

নাই। সীতা-নামটিও ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পূণ্যময় তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন স্ত্রীলোককে আশীর্ব্বাদ করেন, তিনি তাহাকে "সীতার মত হও" বলিয়া থাকেন; বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় রমণীগণ সকলেই আপনাদিগকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, সর্ব্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা, নিত্য-বিশুদ্ধ-স্বভাবা রামভার্য্যা সীতার সদৃশই জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশে একটি কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখন নির্গত হয় নাই। এই সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করা তিনি নিজ কর্ত্তব্যরূপে মনে করিয়া লইয়াছেন এবং স্থির শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। সীতার অরণ্যে নির্ব্বাসনব্যাপার তাঁহার প্রতি কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন, কিন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তি-ভাবের উদয় হয় নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন—"আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না, উহাতে কেবল জগতে একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।" ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধের চিন্তা পর্য্যন্ত কখনও করেন নাই।

ভারতে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—মৃত্যুও তাঁহার প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। তিনি ঐকান্তিক প্রেমবলে যমের নিকট

হইতেও নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তদীয় পিতা তাঁহাকে নিজ স্বামী স্বয়ং মনোনীত করিতে বলিলেন। সত্যবানকে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন। রাজা নারদের কথা শুনিয়া ভয়-বিহ্বলচিত্তে কন্যাকে বলিলেন—"সাবিত্রী, শুনিলে তো, অদ্য হইতে দ্বাদশ মাসান্তে সত্যবান দেহত্যাগ করিবে, অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে—একবার এই কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। বৎসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না। এইরূপ অল্পায়ু আসন্ন-মৃত্যু বরের সহিত তোমার কোনমতে বিবাহ হইতে পারে না।" সাবিত্রী কহিলেন, "পিতঃ, সত্যবান অল্পায়ু হউক, বা আসন্ন-মৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতিই অনুরাগী; আমি মনে মনে সেই সাধুশীল বীর সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে বলিবেন না; তাহা হইলে আমি দ্বিচারিণী হইব। কুমারীর পতি-নির্ব্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে, একবার সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কাহাকেও তাহার মনে কখন স্থান দেওয়া উচিত নহে।"

অবশেষে সেই কাল দিবস উপস্থিত হইল। যম বলিলেন, "আচ্ছা সাবিত্রী, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে অনেক পাপাচরণ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে নরকে যাইতে হইবে; তাহা হইলে কি তুমি তোমার প্রিয়তম পতির সহিত মরিতে প্রস্তুত?" পতির

প্রতি পরম অনুরাগিণী সাবিত্রী কহিলেন, "আমার পতি যেখানে যাইবেন, জীবনই হউক, মৃত্যুই হউক, স্বর্গই হউক, নরকই হউক, আমি পরমানন্দের সহিত তথায় যাইব।"

হিন্দুধর্ম্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি, কেবলমাত্র একটি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তুর সাক্ষাৎকারের চেষ্টা। কিন্তু ইহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার জন্য মাত্র একটি পন্থার নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য, ভাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মূর্খতা—যে কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়তা করে, তাহারই সার্থকতা আছে। মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা কি মনে পড়ে—যিনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভস্ম করিয়া নিজ যোগ-বিভূতিতে স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছিলেন? মনে পড়ে কি, নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির শুশ্রূষা-নিরতা এক নারীর ও পরে ধর্ম্মব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল? ইহারা উভয়েই আজ্ঞাবহতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠারূপ সাধারণ মার্গে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

কোন যুবা-সন্ন্যাসী এক বনে গমন করিয়া অনেকদিন ধরিয়া ধ্যানভজন ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনার পর একদিন তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক কাক ও বক গাছের উপর বসিয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, "কি! তোরা আমার মাথায় শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিলি?" এই বলিয়া তাহাদের দিকে যেমন ক্রোধে কটমট করিয়া চাহিলেন,

অমনি তাঁহার মস্তক হইতে যোগাগ্নি নির্গত হইয়া পক্ষিগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল। আপনার এইরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন—"বা, আমি এক কটাক্ষপাতে কাক-বককে ভস্মসাৎ করিতে পারি!" কিছুদিন পরে তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে নগরে যাইতে হইল। তিনি একটি দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"মা, আমাকে কিছু খাইতে দিন।" ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল—"বৎস, একটু অপেক্ষা কর।" যোগী মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"ওরে পাপিষ্ঠা, তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! তুই আমার শক্তি জানিস্ না!" তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন, আবার সেই আওয়াজ আসিল—"বৎস, নিজের এত অহঙ্কার করিও না, এ কাক-বক-ভস্ম নহে।" তিনি বিস্মিত হইলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অবশেষে এক স্ত্রীলোক আসিলেন।

যোগী তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, "মা, আপনি উহা কিরূপে জানিলেন?" তিনি বলিলেন—"বাবা, আমি তোমার যোগ-যাগ কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্যা স্ত্রী। আমি তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম, ইহাই আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আমি সারাজীবন কর্ত্তব্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যখন অবিবাহিতা ছিলাম, তখন কন্যার কর্ত্তব্য করিয়াছি। এক্ষণে বিবাহিতা হইয়াও আমার কর্ত্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস; এই কর্ত্তব্য করিয়াই আমার দিব্যচক্ষু

খুলিয়াছে। তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি।”

* * *

এদেশে পুরুষে-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন করিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে ত বলে একই চিৎসত্তা সর্ব্বভূতে বিরাজ করেন। তোমরা মেয়েদের নিন্দাই কর; কিন্তু তাহাদের উন্নতির জন্য কি করিয়াছ বল দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখিয়া, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করিয়া এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্র-মাত্র করিয়া তুলিয়াছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের না তুলিলে বুঝি তোমাদের আর উপায়ান্তর আছে? কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হইবে না? ভারতের অধঃপতন হইল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সব আদর্শ-স্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকিবে না কেন? একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার অবশ্য ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

পরব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নাই। আমরা 'আমি-তুমি'র ভূমিতে

লিঙ্গভেদটা দেখিতে পাই ; আবার মন যত অন্তর্মুখ হইতে থাকে ততই ঐ ভেদজ্ঞান চলিয়া যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবিয়া যায়, তখন আর এ-স্ত্রী ও-পুরুষ—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবে ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই বলি, মেয়ে-পুরুষে বাহ্য ভেদ থাকিলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে, তবে স্ত্রীলোক তাহা হইতে পারিবে না কেন? যখন সর্ব্বাবভাসাত্মক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবে, তখন দেখিবে, এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াছি—স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হউক না কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর একটি আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক মোক্ষমূলার উত্তর দিয়াছেন যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়াই সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্ত্যধামে ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকুমার ব্রহ্মচারিণীরূপে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। অধ্যাপক আরও বলেন যে, শরীর-সম্বন্ধ না থাকিলে কি বিবাহে এতই অসুখ? তিনি বলেন, "শরীর-সম্বন্ধ না রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, এ বিষয়ে উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীরা সফলকাম হয় নাই, আমরা মনে করিতে পারি ; কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ

অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।" অধ্যাপকের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! আমাদের ব্রহ্মচর্য্য যে ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায়, তিনি বিজাতি বিদেশী হইয়া তাহা বুঝিতে পারেন এবং ভারতবর্ষে যে ইহা এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন—আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না!

ধর্ম্ম পুরুষের পক্ষে যেমন, রমণীগণের পক্ষেও ব্রহ্মচর্য্যকে তেমনি উচ্চাসন দিয়া থাকেন। পূর্ণ যোগী হইতে গেলে, লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, তবে তিনি লিঙ্গাভিমান দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিবেন কেন? আত্মাতে স্ত্রীপুংভেদারোপ ভ্রম মাত্র—শরীর-সম্বন্ধেই উহা সত্য।

ভারতীয় নারী
ও
পাশ্চাত্ত্য নারী

আমি জাতির দুইটি দিকই দেখিয়াছি; আর আমি জানি, যে জাতি সীতাচরিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কেবল কাল্পনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারী-জাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই।

ভারতীয় নারী ও পাশ্চাত্ত্য নারী

আমার জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট আপনি গঠন করিয়া লইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তাহার পর, তাহারা কি করিবে আপনারাই স্থির করুক।

আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর সামাজিক রীতি-নীতি অতি ধৈর্য্যসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। উহাদের স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার সকলগুলিরই অর্থ আছে, সকলগুলিরই ভাল দিক আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে উহাদের আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, আমরা তাহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাহারা আমাদের অনুকরণ করিবে; সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার শত শত শতাব্দীর অতি মৃদু ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সকলগুলিরই গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও তাহাদের আচার-ব্যবহারগুলিকে যেন উপহাস না করি, তাহারাও যেন আমাদের তদ্রূপ না করে।

ভারতীয় নারী

জনৈক সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়—ইহা খুব সত্য! যে গৃহচ্ছাদ তোমায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে, উহা যে স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিলে চলিবে না—তা তাহারা অতি মনোহর কারুকার্য্যময় 'করিন্থিয়ান. স্তম্ভ'ই হউক। উহার বিচার করিতে হইবে উহার কেন্দ্রস্থানায় সেই চেতন প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা—যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের যে-কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।*

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মতন চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে এক বৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত!

---

* স্বামীজীর অভিপ্রায় ইহা নহে যে, আমেরিকায় অসুখী পরিবার নাই। তিনি জানিতেন যে বহু অসুখী পরিবার আছে ; পরে প্রকাশিত কয়েকটি কথা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ভাল পরিবারও তথায় আছে এবং সেই সব পরিবারের দ্বারাই আমেরিকার পারিবারিক জীবন বিচার করিতে হইবে।

ভারতীয় নারী ও পাশ্চাত্ত্য নারী

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি বহুদূরদেশ হইতে নাম-যশ-ধন-বিত্তাহীন, বুদ্ধিহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য পরিব্রাজকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের যাজককুল এই 'বিপজ্জনক বিধর্ম্মী'কে ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর (বোধ হয় বিপজ্জনক চরিত্রের) সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে দক্ষতরা, কারণ নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা "ডায়নাদেবীর ললাটস্থ তুষার-কণিকার ন্যায় নির্ম্মল," আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না! ভালমন্দ সকল স্থলেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই আপোগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না, কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতির জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবা নিরূপিত হইয়া থাকে।

একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, যে সকল অপক্ক, অপরিণত, কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও তুমি কি তাহাদের সাহায্যে বিচার কর? যদি একটি সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটির দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যে-সব শত শত ফল অপরিণত, তাহাদের দ্বারা নহে।

তারপর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদার মনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদারমনা পুরুষ দেখিয়াছি (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত)। তবে একটি প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশঙ্ক এই যে, তাঁহারা উদারমনা হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন, কিন্তু সেখানে নারীগণ যাহা কিছু ভাল, তাহার প্রতি সহানুভূতি হেতু সেই উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা নিজ ধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না।

এমন পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি ত আর দেখি নাই। তা না হইলে কি ইহাদের উপর ভগবানের এত কৃপা? ইহাদের কি দয়া! যদি খবর পাইল যে একজন গরীব অমুক জায়গায় কষ্টে রহিয়াছে, স্ত্রী পুরুষ সকলে চলিল তাহাকে খাবার, কাপড়, কাজ জুটাইয়া দিতে।

এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে ত শত শত জন আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত! এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভ্রাতাদের জন্য কাঁদে। এখানকার রমণীগণ

দেবীস্বরূপা। আমেরিকান মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রত্যেক আমেরিকান নারী লক্ষ লক্ষ হিন্দু ললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণও কেন না উহাদের মত শিক্ষিতা হইবেন? অবশ্য তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে।

এদের মেয়ে দেখিয়া আমার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে বাচ্চাটির মত ঘাটে মাঠে, দোকান-হাটে লইয়া যায়। সব কাজ করে—আমি তাহার সিকির সিকিও করিতে পারি না। ইহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—ইহারা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব। তবে তোমাদের দেশের লোক মানুষের মধ্যে গণ্য হইবে। তোমাদের পুরুষগুলি ইহাদের মেয়েদের কাছে ঘেঁষিবার যোগ্য নয়—তোমাদের মেয়েদের কথাই বা কি!

আমি এদের এই আশ্চর্য্য মেয়ে দেখি—এ কি মা জগদম্বার কৃপা! মদ্দগুলিকে কোণঠাসিয়া দিবার যোগাড় করিয়াছে। মদ্দগুলি হাবুডুবু খাইতেছে। মা, তোরই কৃপা—মেয়ে-পুরুষের ভেদটার জড় ভাঙ্গিয়া তবে ছাড়িবি। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে না কি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছাড়িয়া দাঁড়াও। বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করিয়া দেশটা গেল। 'সোঽহং সোঽহং, শিবোঽহং শিবোঽহং।' কি উৎপাত!

প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে, নাই নাই বলিয়া কি কুকুর-বিড়াল হইয়া যাইবি না কি ? কিসের নাই, কার নাই ? 'শিবোঽহং শিবোঽহং।' নাই নাই শুনিলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনাহীনা-ভাব, ও হইল ব্যারাম—ও কি দীনতা ? ও গুপ্ত অহঙ্কার। 'ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (বাহিরের পোশাক-পরিচ্ছদ ধর্ম্মের কারণ নহে—সর্ব্বভূতে সমতাই মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ)। 'অস্তি অস্তি, সোঽহং সোঽহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং' (আছে আছে, আমিই ব্রহ্মস্বরূপ, আমিই চিদানন্দস্বরূপ শিব)। 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী' (সিংহের মত মুক্ত ব্যক্তি এই জগৎরূপ জাল হইতে বাহির হইয়া যান)। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (বলহীনের পক্ষে এই আত্মা লভ্য নহে)। Avalanche (তুষারপ্রবাহ)-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফাটিয়া যাক চড়্ চড়্ করিয়া, হর হর মহাদেব। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (আপনি আপনাকে উদ্ধার করিবে)।

ইহাদের মেয়েরা কি পবিত্র ! পঁচিশ বৎসর, ত্রিশ বৎসরের কমে কাহারও বিবাহ হয় না, আর আকাশের পাখীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসারী সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র ! যাহাদের পয়সা আছে তাহারা দিনরাত গরীবের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি ? আমার মেয়ের এগার বৎসরে বিবাহ না হইলে খারাপ হইয়া যাইবে। আমরা কি মানুষ ?

এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তাহারা ভয় ডর করে না।

এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎ পুরুষ

আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম! 'যে দেবী স্বকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমানা'—একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখিয়াছি। আর ইহারা কেমন স্বাধীন! সকল কার্য্য ইহারাই করে। স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথে চলিবার জো নাই। আর ইহাদের কত দয়া! যতদিন এখানে আসিয়াছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খাইতে দিতেছে—বক্তৃতা দিবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করিয়া বাজারে নিয়া যায়, কি না করে বলিতে পারি না। শত শত জন্ম ইহাদের সেবা করিলেও ইহাদের ঋণমুক্ত হইব না।

ইহাদের রমনীগণ সকল রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকার নারী আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিতা ও উন্নতা। পুরুষ অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা অবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে।

পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব নিজেদের হাতে লইতেছে; আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। অবশ্য খুব উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশই পুরুষ।

এদেশের ছেলেরা সব ছোটবেলা হইতে রোজগার করিতে যায়—আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শিখে—ইহার ফলে একটি সভায় দেখিবে যে 90 per cent. (শতকরা ৯০ জন) মেয়ে। ছোঁড়ারা তাহাদের কাছে কলকেও পায় না!

এদেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কার্য্যের জীবনস্বরূপ।

শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলিয়া জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। ইহারা তাহাই দেখে এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে—'যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। ইহারা তাহাই করে, আর ইহারা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি; তাহার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

ধর্ম্ম ইহাদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চমকারের শেষ অঙ্গগুলি বাদ দিয়া—'বামে বামা···দক্ষিণে পানপাত্রং··· অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং···কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।' প্রকাশ্যে, সর্ব্বসাধারণ শক্তিপূজা—বামাচার; মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্টাণ্ট ত ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম্ম ত ক্যাথলিক। সে ধর্ম্মে জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্ত্তি—সব অন্তর্দ্ধান, জাগিয়া বসিয়াছেন 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা', 'মা', 'মা'! বাদশা ডাকিতেছে 'মা', জঙ্গবাহাদুর (Field Marshal) সেনাপতি ডাকিতেছে 'মা', বন্দুকহস্তে সৈনিক ডাকিতেছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকিতেছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকিতেছে 'মা', রাস্তার

কোণে ভিখারী ডাকিতেছে 'মা'—'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী' দিনরাত এই ধ্বনি উঠিতেছে।

আর মেয়ের পূজা। এই শক্তিপূজা কেবল কাম নহে, কিন্তু যে শক্তিপূজা—কুমারী ও সধবা-পূজা আমাদের দেশে কাশী ও কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়—বাস্তবিক, প্রত্যক্ষ; কল্পনা নয়—সেই শক্তিপূজা। তবে আমাদের পূজা তীর্থস্থানেই, সেই ক্ষণমাত্র,—ইহাদের দিনরাত—বারমাস।* আগে স্ত্রীলোকের আসন, যে-সে স্ত্রীলোকের পূজা, চেনা-অচেনার পূজা, ভদ্রকুলের ত কথাই নাই, রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই। এ পূজা ইউরোপে আরম্ভ করে মুরেরা—মুসলমান আরব-মিশ্র মুরেরা—যখন তাহারা স্পেন বিজয় করে, আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাহাদের

---

* সামাজিক প্রথানুসারে পাশ্চাত্ত্য পুরুষেরা সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতিই সম্মান দেখাইয়া থাকেন—স্বামীজী এখানে তাহাই বলিতেছেন। তাহাতে কামের অবকাশ সর্ব্বত্র নাই। কিন্তু যেখানে প্রাণের আবেগে পাশ্চাত্ত্য পুরুষেরা মেয়েদের সম্মান দেখান, সেখানে মেয়েদের যৌবন ও সৌন্দর্য্যই আকর্ষণের প্রধান কারণ হয়। স্বামীজী তৎসম্পর্কে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য নারীপূজা কামের দ্বারা হয়। *c.f.* "The centre of this culture was the Virgin Mary. Although she was always depicted as a mother, yet motherhood was not at all the central idea in this cult as the mother-worship of the old religions. The mother-element was only a small part of the worship of the Virgin. This became rather an adoration of refined and cultured feminity. Keyserling speaks of it as the worship of the Grande Dame"—Denison. —প্রকাশক

আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর, খাতির। ইহা হইতে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মুর ভুলিয়া গেল—শক্তিহীন, শ্রীহীন হইল, স্বস্থানচ্যুত হইয়া আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হইয়া বাস করিতে লাগিল—আর সেই শক্তির সঞ্চার হইল ইউরোপে, মা মুসলমানকে ছাড়িয়া উঠিলেন কৃশ্চানের ঘরে।

স্ত্রীসম্বন্ধীয় আচার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ-মানুষের অন্য স্ত্রী-সংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুশকিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া তেমনি। আর ইউরোপীয় পুরুষ-সাধারণ ও-বিষয়টা এত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও-বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও-বিষয়ে একান্ত বিরত থাকিলে অনেক স্থলে তাহার বাপ-মা দোষাবহ বিবেচনা করে, পাছে ছেলেটা 'মেনীমুখো' হয়। পুরুষের এক গুণ পাশ্চাত্ত্য দেশে চাই—সাহস; ইহাদের 'ভার্চু' (virtue) আর আমাদের বীরত্ব একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, ইহারা কাহাকে পুরুষের সততা বলে। মেয়েমানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে। আমাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়ে উহাদের ঠিক উল্টা, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তাহা কেমনে হয় বল? ইহাদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তত নাই; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ হইলে ছেলেপুলে জন্মায় না এবং

সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ-মানুষে দশ গণ্ডা বিবাহ করিলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশবৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা একসঙ্গে চলে না—ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।"

ভারতবর্ষের পত্নী স্বামীকে যত ভালবাসে, পুত্রকে পর্য্যন্ত স্বপ্নেও সেরূপ ভালবাসিতে পারে না। তাহাকে সতী হইতে হইবে। কিন্তু স্বামী মাতাকে যত ভালবাসে, স্ত্রীকে তত ভালবাসিতে পারিবে না। সুতরাং ভারতে ভালবাসার পরস্পর আদানপ্রদান, প্রতিদান-রহিত ভালবাসার ন্যায় উঁচু জিনিস বলিয়া বিবেচিত হয় না, উহা 'দোকানদারী'। স্বামী ও স্ত্রীর সর্ব্বদা একত্রাবস্থানের আনন্দ ভারতবর্ষে সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এইটি আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্যদিগের নিকট হইতে লইতে হইবে। আমাদের আদর্শকে তাহাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করিয়া লইতে হইবে। আর তাহাদেরও আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা গ্রহণ করা আবশ্যক।

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যান্য সমাজেও তদ্রূপ যথেষ্ট দোষ আছে। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে কখন কখন ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া থাকে, সেখানে পাশ্চাত্ত্য দেশের বায়ু অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া আছে। এখানে জীবন দারিদ্র্য-বিষে জর্জ্জরিত; তথায় বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃত-প্রায়।

যদি আপনারা বিবিধ জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে একজাতি তাহার দোষভাগ এক

উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্নরূপে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যদ্যপি ইহাকে ক্রমশঃ স্বল্প করিয়া একাংশে নিবদ্ধ করা যায়, অপরাংশে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম্ম উৎপাদনার্থ তাঁহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে বাল্য-বিবাহ দ্বারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্তু একথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে সতীত্বধর্ম্মে সমধিক ভূষিত করিয়াছে। তুমি কোনটা লইবে? যদ্যপি জাতিকে সতীত্ব-ধর্ম্মে সমধিক ভূষিত করা বাঞ্ছনীয় মনে কর, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে শরীর-সম্বন্ধে অধোগামী করিতে ইচ্ছুক হইয়া পড়। অপরদিকে ইউরোপীয়েরা কি তাহাদের দিক্ হইতে বিপদ্শূন্য? কখনই না। কারণ সতীত্বই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন প্রথম অসতীত্বের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠে? যখন ইহা কোন জাতির ভিতর প্রবেশ করে, তখনই উহার বিনাশ আসন্ন হইয়া থাকে। এই সকল দুঃখকর প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় পাইব? যদি পিতামাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে এই তথাকথিত প্রেমনামক ব্যাধি নিবারিত হয়। ভারতের দুহিতৃগণ ভাবুকতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলা। তাহাদের জীবনে ভাব-প্রবণতা অধিক স্থান পায় না। নিজেরা স্বামী ও স্ত্রী নির্ব্বাচন করিলেই যে তাহাতে অধিক সুখ হইবে, এমন কথা বলা যায় না।

ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে পরস্পর কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে, যুক্তরাজ্যে, যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিরাজমান, সেখানে সুখী পরিবার প্রায়ই নাই। অল্পসংখ্যক সুখী পরিবার হয় ত বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু অসুখী পরিবার ও অসুখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা বর্ণনাতীত। আমি যে-কোন সভায় গমন করিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি যে, সেখানে উপস্থিত একতৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক তাহাদের পতিপুত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্র। ইহা কী প্রকাশ করিতেছে? ইহা প্রকাশ করিতেছে, এই সকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপার্জ্জিত হয় নাই। আমরা সকলেই সুখের জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই, অপর দিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।*

প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেই-খানটা হইতে সেই জাতির রীতিনীতি বিচার করিতে হইবে। তাহাদের চোখে তাহাদের দেখিতে হইবে। আমাদের চোখে ইহাদের দেখা, অথবা ইহাদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুটিই ভুল।

---

* প্রত্যেক জিনিসকে স্বামিজী তাহার আদর্শের দিক হইতেই বিচার করিতেন। ইংলণ্ডের পথে তিনি একদিন গভীর নিদ্রার পর জাহাজের ডেকে আসিয়া আমাকে বলিতেছেন যে, তিনি স্বপ্নে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিবাহের আদর্শ লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে এই দুইটির প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা জগৎ মোটেই উপেক্ষা করিতে পারে না। শেষবারে আমেরিকা-ভ্রমণ-সমাপ্তিকালে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয়কালে তিনি উহা দ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি প্রধানতঃ উহার ধন ও শক্তি-লিপ্সাই দেখিতেছেন।—ভগিনী নিবেদিতা

সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপর দিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এদেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহু জনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার আকস্মিক স্রোতঃপাতে এবং তুলনায় পাশ্চাত্ত্য নারীদের অবস্থা-পার্থক্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের দেশের নারীদের হীন দশা অতি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শতাব্দীর বহু ঘটনা-বিপর্য্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, 'স্ত্রীজাতি হীন'—এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া নহে।

আমি জাতির দুটি দিকই দেখিয়াছি, আর আমি জানি, যে জাতি সীতাচরিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কেবল কাল্পনিকও

হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলার স্কন্ধে আইনের বলে এমন অনেক বোঝা চাপান হইয়াছে, যাহা এ দেশীয় নারীর অজ্ঞাত। আমাদের নিশ্চিত অনেক দোষও আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যায় আছে, কিন্তু সে সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটি এখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতের প্রেম, মৃদুতা ও সাধুতা বাহিরের কার্য্যে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে, আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির দ্বারা যতটা সম্ভব ঐ সব ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের প্রথাসমূহ হইতে ভারতীয় প্রথাসমূহের নানা ভাবে অধিক উপযোগিতা আছে।

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান—সন্দেহ কি! আমার পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই ধারণা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণের যে-সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্রও সহানুভূতি নাই।

আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই

বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও—আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্র গুণে দিবার আছে।

ভারতীয়নারীর ভবিষ্যৎ
ও
সমস্যা-সমাধান

মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখন বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পারিবেও না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা।

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ ও সমস্যা-সমাধান

আমাকে বারংবার প্রশ্ন করা হইয়াছে—আপনি বিধবাদিগের ও সমগ্র রমণীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি মনে করেন? আমি এই প্রশ্নের চরম উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে আমাকে এই বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি স্ত্রীলোক যে আমাকে বারবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে হে, গায়ে পড়িয়া নারী-জাতির সমস্যা-সমাধানে আগুয়ান হইয়াছ—তুমি কি প্রত্যেক বিধবার ও প্রত্যেক রমণীর অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ ভগবান নাকি? তফাৎ! উহারা আপনাদের সমস্যা আপনারাই পূরণ করিবে। কি আপদ! যথেচ্ছাচারী অত্যাচারিগণ, তোমরা ভাবিতেছ—তোমরা সকলের জন্য সব করিতে পার! যাও, তফাৎ হও! ভগবান সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, তুমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া লইয়াছ? হে নাস্তিকগণ, তোমরা খোদার উপর খোদকারী করিতে সাহস কর কিসে? কারণ, হে নাস্তিকগণ, তোমরা কি জান না, সকল আত্মাই পরমাত্মার স্বরূপ? নিজের চরকায় তেল দাও, তোমার ঘাড়ে কি বোঝা কম রহিয়াছে? হে নাস্তিকগণ, তোমাদের সমগ্র জাতি তোমাকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, তোমাদের সমাজ তোমাকে হাততালি দিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, আহাম্মকেরা তোমার সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নহেন, তিনি তোমাকে ধরিয়া ফেলিবেন, আর ইহলোকে বা পরলোকে নিশ্চিত তোমাকে শাস্তি দিবেন।

অতএব প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বর-দৃষ্টিতে দেখিতে থাক।

সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না। ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, উহার মূলদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূল সংস্কার—প্রকৃত সংস্কার নাম দিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।

সমাজসংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের কোন বিষয়ে দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা বুঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের কতকগুলি বিষয়ে দোষবোধ হইলেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না—সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর, বিধান আপনাআপনি আসিবে। প্রথম যে শক্তিবলে, যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন প্রাচীন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই শক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম প্রয়োজন লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

বাজে সমাজসংস্কার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিবে না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হইলে সমাজসংস্কার হইতে পারে না। কে তোমায় বলিল, আমি সমাজসংস্কার চাই? আমি ত তাহা চাহি না। ভগবানের নাম প্রচার কর।

ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে, প্রথমে এ দেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে হইবে।

আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ও দিকে নয়'—বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে।

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য—একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষে মেজে রূপ কি হয়? ধরে বেঁধে পীরিত কি হয়?" ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীন, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারিবে, তখন ত তুমি বুদ্ধ হইবে, তুমিই মুক্ত হইবে, সে ঢের দূরে! আবার তাহার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়া? আহা! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!! আহা, বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসা না হইয়া কি যায়! এই বলিয়া নাকি কান্নার এক ধূয়া উঠিয়াছে। আর পুরুষের বেলা—!

ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাবে সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠস্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।

প্রভো, এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমরা মহাপাপী—স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট, নরকমার্গ—ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া অধোগতি হইয়াছে। বাপ, আকাশ-পাতাল ভেদ!! প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলিয়াছেন, 'ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী'—তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী। আর আমরা বলিতেছি, "দূরমপসর রে চণ্ডাল"—ওরে

চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা; "কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী"—কে এই মোহিনী নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে!

প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা যে যে কার্য্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। সকল ব্যক্তিকেই তাহার আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তি সাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ একথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমূক ছেলেটির মুক্তি দিয়া দিব, তবে উহা অতি অন্যায় কথা, অত্যন্ত ভুল কথা বলিতে হইবে।

চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

যীশুখ্রীষ্ট নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নাই। স্ত্রীলোকেরাই তাঁহার জন্য সব করিল, কিন্তু তিনি য়াহুদিদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিত শিষ্য' (Apostle)-পদে উন্নীত করেন নাই। বুদ্ধ ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমানাধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন, আর তাঁহার নিজের স্ত্রীই তাঁহার প্রথম ও একজন প্রধানা শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হইয়াছিলেন।

নারীর সম্বন্ধে আর্য্য ও সেমেটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত। সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের

কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্য পক্ষী মারাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্য্যদের মতে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত পুরুষে কোন ধর্ম্মকার্য করিতে পারে না।

প্রাচীনকালে গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার ছিল না—ধর্ম্মকার্য্যের সময় পত্নী অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই—সেই জন্যই পত্নীর একটি নাম সহধর্ম্মিণী, যাঁহার সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু-গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু পত্নী সঙ্গে থাকিয়া উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার কর্ত্তব্যটুকু অনুষ্ঠান না করিলে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিকভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি-কাল বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া গিয়াছিলেন যে, গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতিদান-রূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত হইতে পারে না, তাঁহারই আবার শালগ্রাম-শিলা অথবা গৃহ-দেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, এই সকল পূজা পরবর্ত্তী পৌরাণিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

আমাদের নারী ও পুরুষদের মধ্যে অধিকার-বৈষম্যের কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা তাহার গৌরব তাহাই তাহার দুর্ব্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধে সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল; আর ঐ

শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম্ম মাত্র। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর ভেক পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্ব্বপ্রথম মঠ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষাপেক্ষা নিম্নাধিকার* দিতে হইল। কারণ, বড় বড় মঠ-স্বামিনীগণ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ, অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্ম-সঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা-স্থাপন হইয়াছিল; কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাঁহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়।

বেদেও সন্ন্যাসের বিধি ছিল, কিন্তু ঐ বিষয়ে নরনারীর কোনও প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ আছে ত? তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার দিনে ঐরূপ মহিলাগণকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধনুষ্কের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের ন্যায়'; এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদ্‌সমূহে বালকবালিকার সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়—

* অর্থাৎ মঠ-জীবনে আধ্যাত্মিক অধিকার সবই সমান ছিল। সঙ্ঘের দিক হইতে নিম্নাধিকার ছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সাম্যই বর্ত্তমান ছিল।

শকুন্তলার উপাখ্যান পড়, তারপর দেখ টেনিসনের 'প্রিন্সেস্'* হইতে আর আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কি না।

আমি বলিতেছি না যে, আমাদের সমাজের নারীগণের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও সে যোগ্যতালাভে সমর্থা। তোমাদের নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও; তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা তোমাদিগকে বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?

মনু বলিয়াছেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান

---

* Princess—কোন দেশের বিদুষী রাজকন্যা সুসভ্য দেশসমূহেও বর্ব্বর-জাতি-সুলভ নরনারীর নানাবিধ অধিকার-বৈষম্য ও নারীজাতির হীনতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হন। তিনি দুইজন সহচরীর সাহায্যে একটি বিদ্যালয় খুলিয়া নারীদিগকে পুরুষাধিকৃত বিদ্যা শিক্ষা দিতে থাকেন। বিদ্যালয় নারীর দ্বারাই পরিচালিত হইত, পুরুষের প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত ছিল না। আসিলে প্রাণদণ্ড হইবে এইরূপ বিধান ছিল।

করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এই জন্য ইহাদের আগে তুলিতে হইবে—ইহাদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করিতে হইবে।

ভগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রহিয়াছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া রাহিয়াছে। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারই জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি আন্তর বিকাশে আবার মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ, সিদ্ধ-সংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ করিয়া দেয়—সেই মাতৃরূপিণী স্ফুরদ্বিগ্রহরূপিণী মেয়ের পূজা করিতে আমি কখনও নিষেধ করি না। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—এই মহামায়াকে পূজা, প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করিতে পারিলে সাধ্য কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্য্যন্ত তাঁহার হাত ছাড়াইয়া মুক্ত হইয়া যান? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশ-কল্পে—মেয়েদের মঠ করিয়া যাইব।

গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি লওয়া হইবে। তাহাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকিবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকিবে। আর ভক্তিমতী গৃহস্থের মেয়েরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতে পাইবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাকিবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর হইতে স্ত্রী-মঠের কার্য্যভার চালাইবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকিবে, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্পবিস্তর ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া

হইবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশু-পালনের স্থূল বিষয়গুলিও শিখান হইবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা—এই সব ত শিক্ষার অঙ্গ থাকিবেই।

দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়-ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন।

মনে রাখিবে, মেয়ে-পুরুষ দুই-ই চাই, আত্মাতে মেয়ে-পুরুষের ভেদ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিলেই হয় না—শক্তির বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—তাহারা আগুনের মত হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়াইয়া পড়িবে।

যাহারা বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে এখানে থাকিতে পারিবে, তাহাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ হইতেই দেওয়া হইবে। যাহারা তাহা পারিবে না, তাহারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীরূপে আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকিতে, ও যতদিন থাকিবে, খাইতেও পাইবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার লইবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাহাদের বিবাহ দিতে পারিবে। যোগ্যাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হইলে অভিভাবকদের মত লইয়া ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারিবে। যাহারা চিরকুমারী-

ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহারাই কালে মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হইয়া দাঁড়াইবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করিবে। চরিত্রবতী, ধর্ম্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইবে। স্ত্রী-মঠের সংস্রবে যতদিন থাকিবে, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এ মঠেরও ভিত্তিস্বরূপ হইবে। ধর্ম্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হইবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখিলে কে তাহাদের না সম্মান করিবে—কেই বা তাহাদের অবিশ্বাস করিবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হইলে তবে ত তোমাদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হইবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হইয়া তোমাদের মেয়েরা এখন কি যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার পাশ্চাত্ত্য দেশ দেখিয়া আসিলে বুঝিতে পারিতে। মেয়েদের ঐ দুর্দ্দশার জন্য তোমরাই দায়ী। আবার, দেশের মেয়েদের জাগাইয়া তোলাও তোমাদের হাতে রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, কাজে লাগিয়া যাও।

এই মঠে শিক্ষালাভের পর সকল মেয়ের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা কি একেবারেই হয়? শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার পর নিজেরাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় করিবে। বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেও ঐরূপ শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে ও বীরপুত্রের জননী হইবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহের নামগন্ধ করিতে পারিবে না—এই নিয়ম রাখিতে হইবে।

আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।

তোমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোমরা লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইতেছ, কিন্তু যাহারা তোমাদের সুখদুঃখের ভাগী, সকল সময় প্রাণ দিয়া সেবা করে, তাহাদের শিক্ষা দিতে, তাহাদের উন্নত করিতে তোমরা কি করিতেছ? তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসনে তোমাদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হইয়াছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তা আবার মেয়েদের ভিতর! গবর্ণমেণ্টের আদমসুমারীতে দেখা যায়—ভারতবর্ষে শতকরা দশ-বার জন মাত্র শিক্ষিত; তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও হইবে না। তাহা হইলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ—এই সব না হইলে দেশের উন্নতি কি করিয়া হইবে? তোমরা দেশের যে কয়জন লেখা-পড়া শিখিয়াছ—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভিতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা-উদ্দম দেখিতে পাই না। কিন্তু জানিবে, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে কিছু হইবার জো নাই। সেজন্য আমার ইচ্ছা আছে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈয়ার করিব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হইবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবে। কিন্তু দেশী ধরণে ঐ কাজ করিতে

হইবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র করিতে হইবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করিতে হইবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার লইবে। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণী-গণের উপরেই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্ব্বদা রাখা উচিত। এদেশের স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পুরুষের সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র-গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। মেয়েদের তোমরা এখন যেন কতকগুলি কাজ করিবার যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছ। এই কি তোমাদের শিক্ষার ফল হইল? মেয়েদের আগে তুলিতে হইবে, আপামর সাধারণকে জাগাইতে হইবে, তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইত না, ঠিক যেমন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালায়, অফিসে যায়, স্কুলে যায়, প্রফেসারী করে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার

পাইয়াও তোমরা ইহাদের উন্নতি করিতে পারিলে না! ইহাদের ভিতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করিলে না! ঠিক ঠিক শিক্ষা পাইলে ইহারা আদর্শ স্ত্রীলোক হইতে পারে। ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এই সকল বিষয়ে স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলিই মেয়েদের শিখান উচিত। নভেল নাটক ছুঁইতে দেওয়া উচিত নয়। কেবল পূজা-পদ্ধতি শিখাইলেই চলিবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটাইয়া দিতে হইবে। আদর্শ নারী-চরিত্রসকল ছাত্রীদের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাহাদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা —ইঁহাদের জীবন-চরিত্র মেয়েদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের জীবন ঐরূপ গঠিত করিতে হইবে।

যে রকম শিক্ষা চলিতেছে, সে রকম নয়। সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বই-পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শিখা দরকার। এসময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রাণী কেমন ছিলেন!

মেয়েদের শিখাইতে হইবে, নিজেদেরও শিখিতে হইবে। খালি বাপ হইলেই ত হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করিতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষাও ত সহজে দেওয়া

যাইতে পারে—হিন্দুর মেয়ে, সতীত্ব কি জিনিস তাহা তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত কিনা! প্রথমে সেই ভাবটাই তাহাদের মধ্যে উস্‌কাইয়া দিয়া তাহাদের চরিত্রগঠন করিতে হইবে - যাহাতে তাহারা, বিবাহ হউক বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে রকম সময় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল হইতে আছে, তাহারই বলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চিরকুমারী রাখিয়া ত্যাগ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হইতে পারে, তাহাও শিখাইতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা অতি সহজেই ঐ সব শিখিতে পারিবে ও ঐরূপ শিখিতে আমোদও পাইবে। আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য ঐ রকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষার ধারণা এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দশিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাই ও মীরাবাই-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা

স্বার্থগন্ধশূন্যা বীর রমণী হইবে—ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শে যে বীর্য্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্য্যশালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবে।

আমি ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম্ম বলিতেছি না। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তদ্রূপ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।

শিক্ষাই বল, আর দীক্ষাই বল—ধর্ম্মহীন হইলে তাহাতে গলদ থাকিবেই থাকিবে। এখন ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষা গৌণ হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতোদ্‌যাপন—এইজন্য শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমান কালে এ পর্য্যন্ত যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মটাকেই গৌণ করিয়া রাখা হইয়াছে; তাহাতেই আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার যে-সকল দোষ দেখিতে পাও তাহা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাহাদের ঐরূপ বেচালে পা পড়িয়াছে। সকল সৎ কার্য্যের প্রবর্ত্তককেই অভীপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তাহার কাজে গলদ থাকিবেই। তথাপি যাঁহারা অধুনা-প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রী-শিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মহাপ্রাণতায়

কি সন্দেহ আছে? দেশে নূতন ভাবের প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে না পারিয়া খারাপ হইয়া যায়। তাহাতে বিরাট সমাজের কি আসিয়া যায়? এই মায়ার জগতে যাহা করিতে যাইবে, তাহাতেই দোষ থাকিবে—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ"—আগুন থাকিলেই ধূম উঠিবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? যতটা পার ভাল কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

আমরা কি মানুষ! তন্ত্র বলিতেছেন—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" ছেলেদের যেমন ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা হইবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? —তবে আশা আছে, নতুবা পশু-জন্ম ঘুচিবে না।

আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দেখিয়া ও তাহাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টাইয়া যাইবে। এখন ধরিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই হইল—তা নয় বৎসরেরই হউক, দশ বৎসরেরই হউক! এখন এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে তের বছরের মেয়ের সন্তান হইলে গুষ্টিশুদ্ধর আহ্লাদ কত; তাহার ধূমধামই বা দেখে কে? এই ভাবটা উল্টাইয়া গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসিতে পারিবে। যাহারা ঐ রকম ব্রহ্মচর্য্য করিবে, তাহাদের ত কথাই নাই—কতটা শ্রদ্ধা, কতটা নিজেদের উপর বিশ্বাস তাহাদের হইবে তাহা মুখে বলা যায় না।

ক্রমে সব হইবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়

নাই, যাহারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হইয়া নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখিতে পারে। এই দেখ না—এখনও মেয়ে বার তের বৎসর পার হইতে না হইতে লোকভয়ে, সমাজভয়ে বিবাহ দিয়া ফেলে। এই সেদিন 'সম্মতিসূচক আইন' করিবার সময় সমাজের নেতারা লক্ষ লোক জড় করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন 'আমরা আইন চাই না!'—অন্য দেশ হইলে সভা করিয়া চেঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজিয়া লোক ঘরে বসিয়া থাকিত ও ভাবিত—'আমাদের সমাজে এখনও এ হেন কলঙ্ক রহিয়াছে!'

বাঙ্গলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়ার নিয়মটা উঠিয়া গিয়াছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্ব্বের অপেক্ষা দুই-এক বৎসর বেশী বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেটা হইয়াছে টাকার দায়ে। তা যে জন্যই হউক, মেয়েদের আরও বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ বেচারীরা করিবে কি? মেয়ে বড় হইলেই বাড়ীর গিন্নী হইতে আরম্ভ করিয়া যত আত্মীয়েরা ও পাড়ার মেয়েরা বিবাহ দিবার জন্য নাকে কান্না ধরিবে। আর তোমাদের ধর্ম্মধ্বজীদের কথা বলিয়া কি হইবে। তাহাদের কথা ত আর কেহ মানে না, তবুও তাহারা আপনারাই মোড়ল সাজে। রাজা বলিলেন যে, বার বৎসরের মেয়ের সহবাস করিতে পাইবে না, অমনি দেশের সব ধর্ম্মধ্বজীরা 'ধর্ম্ম গেল গেল' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। বার-তের বছরের মেয়ের গর্ভ না হইলে তাহাদের ধর্ম্ম হইবে না! রাজাও মনে করেন, 'বা রে এদের ধর্ম্ম! এরাই আবার রাজনৈতিক আন্দোলন করে, রাজনৈতিক দাবি চায়!'

বাল্যবিবাহের মূলতত্ত্বটি অবশ্য নির্দোষ; কিন্তু এখন আমরা সেই মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। বাল্য-বিবাহ-প্রথা যে-সকল মূল-ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাব অবলম্বনে প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নরনারীকেই অপর যে-কোন নরনারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্টপ্রকৃতি, অসুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপরদিকে ইহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এরূপে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার-চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই, বরং কিরূপে সমাজ হইতে এই সকল দোষ, এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি নিবারিত হইতে পারে, ইহাই মহা সমস্যা। আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকে ভোগ করিতে হয়; সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়—এ বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ-প্রথার পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠিতে বরকন্যার যেরূপ জাতি, গণ প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভব পুত্র আর্য্য নহে। যে সন্তানের জন্মমৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আর্য্য। আজকাল এইরূপ আর্য্যসন্তান খুব অল্পই

জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে ; আমরা প্রাচীন আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা এক্ষণে এই সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না ; আমরা এই সকল মহান্ ভাবের কতকগুলিকে লইয়া একটি বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। আজকাল আর প্রাচীনকালের মত পিতামাতা নাই। সমাজও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষিত নহে, আর প্রাচীন সমাজের যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজে তাহা নাই।

বাল্যবিবাহে অকালে সন্তান প্রসব করিয়া অধিকাংশ মেয়েরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হইয়া দেশের ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম ও সবল না হইলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কিরূপে ? লেখাপড়া শিখিয়া একটু বয়স হইলে বিবাহ দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তানসন্ততি জন্মাইবে, তাহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে। তোমাদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তাহার কারণ হইতেছে এই বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ কমিয়া গেলে বিধবার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে।

বাল্যবিবাহের উপর আমার প্রবল ঘৃণা। ইহার ফলে আমরা ভয়ানক ভুগিয়াছি এবং এই মহাপাপেই আমাদের জাতিকে ভুগিতে হইতেছে। এমতাবস্থায় মুখ্য বা গৌণভাবেও যদি আমি এরূপ আসুরিক প্রথার সমর্থন করি, তবে আমার আত্মগ্লানির সীমা থাকিবে না। এই প্রথাকে আমার যথাসাধ্য পদদলিত করিতেই হইবে ; আমি কাহারও সাহায্য চাই না, যদি কেহ ভয় পায় সে

নিজেকে দূর হইতে বাঁচাইয়া চলুক। শিশুদের বিবাহের ঘটকালি-ব্যাপারে আমি লিপ্ত থাকিতে পারি না, কখন ছিলাম না এবং ভগবানের কৃপায় কখন থাকিবও না। শিশুর বর জোটায় যাহারা, আমি তাহাদের খুন করিতে পারি। মোট কথা এই যে, আমার সাহায্যের জন্য আমি সাহসী, নির্ভীক ও বেপরোয়া লোক চাই। নতুবা আমি একাই কাজ করিব। আমার জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমি একাই উহা সাধন করিয়া যাইব, কে আসে যায় তাহা আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না।

কি মহাপাপী! দশ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দেয়! আট বৎসরের মেয়ের সহিত ত্রিশ বৎসরের পুরুষের বিবাহ দিয়া মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আটখানা! ছয় বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁহারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের কোন্ দেশী ধর্ম্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমান-দের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্রগুলি পড়িয়া দেখ দেখি।

আমার মত এই যে, বাল্যবিবাহের মূলতত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া মেয়ে-পুরুষের সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তাহা না হইলে অনাচার-ব্যভিচার আরম্ভ হইবে।

ভালমন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনাআপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলিয়া দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মাথা না ঘামাইয়া, আমাদের কার্য্য হইতেছে স্ত্রী-পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া; সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল,

কোন্‌টি মন্দ সব বুঝিতে পারিবে ও আপনারাই মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে না।

আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না—উহা নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার ?

যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে, এক্ষণে আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটি আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণে আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল পরিবর্ত্তন উঠিতেছে এবং এখনও উঠিবে, তাহা তাঁহারা বাস্তবিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদ-লোপকারী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা জাতিভেদ-রাহিত্য-অর্থে বুঝিতেন না যে, যত আহাম্মক ও পাগল মিলিয়া যখন যেখানে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যানুসারে কোন জাতির উন্নতির পরিমাপ করিতে হইবে। এরূপ জাতি ত আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার উন্নতি বা শুভাশুভ অদৃষ্ট তাহার বিধবাগণের পতির সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াছে।

ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যদি

স্ত্রীলোককে একাধিকবার বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায় তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। এই সকল গোঁড়ামি। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও গোঁড়া হইতে পারেন না। গোঁড়ারা প্রকৃত কার্য্য করিতে পারে না।

ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনাআপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী অহিতকারী উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেইরূপে সেই সময়ের জন্য রক্ষা পায়, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচে তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়। যথা, আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ-প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষজাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায়-অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুইটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক একটির এক একটি পাত্র মেলাই কঠিন, এক একজনের দুই তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। যে

সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা কম, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশে এই প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড় সঙ্কট হইতেছে।

এই প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।

বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি-না, আজকাল এই সমস্যাও এইরূপে সামাজিক ভিত্তির উপর উপস্থাপিত না হইয়া বরং এক অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত শতাব্দীতে যে-সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পোশাকী ধরণের। এই সংস্কারের চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় রমণীর কোন স্বার্থই নাই। আর এতদ্বিধ সকল আন্দোলনই সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে-সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদেরই জন্য। তাঁহারা নিজেদের ঘর শক্ত করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

ভারতবর্ষে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহটা হওয়া দরকার, তাহা না হওয়ায় জাতির শারীরিক দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। বিধর্ম্মী জাতিদের

ভিতর আদানপ্রদান হওয়ার কথা বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ উহা সমাজবন্ধনকে শিথিল করিয়া নানা উপদ্রবের কারণ হইবে, এ কথা নিশ্চিত। জান ত, অর্জ্জুন বলিয়াছেন—'ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং' ইত্যাদি। স্বধর্ম্মীদের মধ্যে বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি বলিয়া থাকি।

বিভিন্নপ্রদেশবাসী ও বিভিন্নভাষাভাষীদের মধ্যেও এইরূপ বিবাহ হইতে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। একেবারে ওরকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা রহস্য হইতেছে এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা কম বাধার পথে চলিতে হয়। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলুক। এই বাঙ্গালা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। প্রথমে উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ীতে বিবাহ হউক। যদি তাহা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীতে হউক। এইরূপে যাহা আছে তাহাকেই গড়িতে হইবে—ভাঙ্গার নাম সংস্কার নয়।

দেখিতে পাইতেছ না, আমাদের সমাজের এক এক শ্রেণীর মধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া বিবাহ চলিতে চলিতে এখন ধরিতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেই শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে যত রোগাদিও আসিয়া জুটিতেছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতরই রক্ত চলাফেরা করিয়া দূষিত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের শরীরগত রোগাদি লইয়াই নবজাত সকল বালক জন্মাইতেছে। এইজন্য তাহাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে

প্রতিহত করিবার ক্ষমতাও ঐ সব শরীরের বড় কম হইয়া পড়িয়াছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্য রকম রক্ত বিবাহের দ্বারা আসিয়া পড়িলে এখনকার রোগাদির হাত হইতে ছেলেগুলি পরিত্রাণ পাইবে ও বর্ত্তমান অপেক্ষা ঢের কর্ম্মতৎপর হইবে।

প্রত্যেক সমাজেই সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপান আছে। মহাভারতের ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু আশ্চর্য্য আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতপ্রণেতা পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ সামাজিক প্রথা বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণনির্দ্দেশের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ-আজ্ঞা—তাঁহাদের জননী এই অদ্ভুত পরিণয়ে সম্মতি দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা যুক্তি দিয়া মহাভারতকার এই ঘটনাটির উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জানা আছে, সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল যে, বহু-পতিত্ব সমাজের অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্ত্তী আভাস।

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্য্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশে এক স্ত্রীলোকের বহুপতি-থাকা-প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়ভ্রমণকালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারের ছয় জন পুরুষ এবং ঐ ছয় জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা

জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "তুমি সাধু-সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতেছ? 'এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়' —এরূপ ভাব কি অন্যায় নহে?" আমি ত শুনিয়া অবাক্।

যেখানে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিব্বতে, তথায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক বলবান হইয়া থাকে। যখন ইংরাজেরা ঐ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে লইয়া পাহাড় চড়াই করে।

মালাবার দেশে অবশ্য স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ নাই, কিন্তু তথায় সব বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য। সৈনিক, শিক্ষক, প্রহরী, মুটে-মজুর প্রভৃতি সব রকমের কাজ মেয়েরাই করে। তথায় সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিদ্যাচর্চ্চায় যারপরনাই উৎসাহ। আমি যখন ঐ দেশে গিয়াছিলাম, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, যাহারা উত্তম সংস্কৃত বলিতে পারে। কিন্তু ভারতের অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একজনও পারে কিনা, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতিই হয়, কিন্তু দাসত্ব হইতে অবনতি হইয়া থাকে। পর্ত্তুগীজ বা মুসলমানেরা কখনও মালাবার জয় করে নাই।

দ্রাবিড়ীরা আর্য্যদের পূর্ব্বেই ভারতে আসিয়াছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল।

আদিম অবস্থায় বিবাহ ছিল না, ক্রমে ক্রমে যৌনসম্বন্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্ব্বসমাজে মাতৃসম্বন্ধের উপর ছিল—বাপের বড় ঠিকানা থাকিত না। মায়ের নামে ছেলে-

পুলের নাম হইত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন আসিত ছেলে মানুষ করিবার জন্য। ক্রমে ধন-পুত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বলিল, "যেমন এ ধন-ধান্য আমার, আমি চাষবাস করিয়া বা লুটতরাজ করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছি, ইহাতে যদি কেহ ভাগ বসায় ত আমি বিরোধ করিব, তেমনি এ মেয়েগুলি আমার, ইহাতে যদি কেহ হস্তার্পণ করে ত বিরোধ হইবে।" এইরূপে বর্ত্তমান বিবাহের সূত্রপাত হইল। মেয়েমানুষ পুরুষের ঘটি বাটি গেলাস প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হইল। প্রাচীন রীতি—এক দল পুরুষ অন্য দলে বিবাহ করিত—সে বিবাহও জবরদস্তি, মেয়ে ছিনাইয়া আনিয়া। ক্রমে সে কাড়া-কাড়ি বদলাইয়া গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চলিল। কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস থাকিয়া যায়। এখনও প্রায় সকল দেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে। বাঙ্গালাদেশে, ইউরোপে চাল দিয়া বরকে আঘাত করে; পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয়া বরকে গালিগালাজ করে—ইত্যাদি।

সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

যদি তুমি কাহাকেও সিংহ হইতে না দাও, তাহা হইলে সে ধূর্ত্ত শৃগাল হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হইতেছে; তাহার কারণ

পুরুষে তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে। এখন সে শৃগালীর মত ; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হইবে না, তখন সে সিংহী হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—"যখন অনন্ত জীবন-নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে কেন?" প্রশ্ন এই—ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? আমি ইংলণ্ডে জনৈকা সৎবালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, "এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।" আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি, আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোকবিস্তারের সহায়তা করিয়াছি? আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদের দোষ—আমাদেরই কর্ম্ম। কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও আমাদের নিজেদের কর্ম্মকে।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল, সমাজে

যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য রূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা আর যে দুঃখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহার দিকে ঘৃণাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিবে না; কারণ, তোমরা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবে। তখন তোমাদের আর ঈর্ষা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদয় হইবে না; ঐ সবই চলিয়া যাইবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কাহারও অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না। ইহাতে অধ্যাপক মোক্ষমূলারের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, "শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও এই অপরাধে অপরাধী।" আহা, কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরৎ ঈশার দয়াপ্রাপ্তা সামরিয়া নারীর কথা মনে পড়ে! দারুণ অভিযোগই বটে—মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষেরা কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁর সুরে কেন কথা কহিতেন না! আক্ষেপকারীর এই অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে! যাক্ রসাতলে যদি ঐ প্রকার নীতিসহায়ে উঠিতে হয়!!

বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ,

পুণ্যবানের জন্য তত নহে। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি—নরকদ্বাররূপ বহু ভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ ও নরকে ভেদ কি? আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী, অপাপী, সাধু, অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা, নরনারী সকলের সমান অধিকার—বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নর-নারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

যদি তীর্থস্থানেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্ম্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসিবে সে ভাসিয়া যাইবে।

যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও 'ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ-জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক' ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয় ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁহার পায়ে মাথা নোয়াইতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত আসুক—তাঁহার অবারিত দ্বার! "বরং একটি উষ্ট্র স্থচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" এই সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসভাব মনেও স্থান দিবে না। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই।

যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন—যাও তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর ; বলি—জীবনবলি —তাহাদের জন্য, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন-দরিদ্র, পতিত-উৎপীড়িতদের জন্য।

পরিশিষ্ট

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভাবী নারী-সমাজের চিত্র

(ভগিনী নিবেদিতা)

কৈবর্ত্তকুলোদ্ভবা ধনাঢ্যা রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারীর পদে ব্রতী হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সে প্রভাবের সম্যক্ পরিচয় সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের শিষ্যমণ্ডলী যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলেন, এক হিসাবে তাহার মূলে ছিলেন অনুচ্চশ্রেণীর এক মহিলা। লৌকিকভাবে বলিতে গেলে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইত না, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা হইতে না, এবং বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম্মপ্রচার হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটীনির্ম্মাণের উপরই এই ঘটনা-পরম্পরা নির্ভর করিতেছে। উহাও আবার অনুন্নত-সম্প্রদায়-সম্ভূতা জনৈকা ধনাঢ্যা রমণীর ভক্তির ফলস্বরূপ।

আমাদের আচার্য্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন তৎসম্বন্ধে মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও অনুন্নতশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধনই উহার জীবনের ব্রত। খেতড়ীর রাজাকে

পাঠাইবার জন্য যখন তিনি আমেরিকায় ফনোগ্রাফের সম্মুখে কয়েকটি কথা কহেন, তখন আপনা হইতে এই বিষয়টিই তাঁহার মনে আসিয়াছিল। বিদেশে যখনই তিনি আপনাকে অন্য সময় অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন এবং নিকটে কোন গুরুভ্রাতা না থাকিতেন, তখনই ঐ চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিত, এবং তিনি সমীপস্থ শিষ্যকে বলিতেন, "কখনও ভুলিও না 'স্ত্রীজাতি এবং অনুন্নতশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।"

কিন্তু এই প্রকার মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে। সন্ন্যাসী জীবনকে শুধু সাক্ষিরূপে দেখিয়া যাইবেন, উহাতে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। অনেক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার নিকট এমন সব প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাহা গ্রহণ করিলে তিনি উহাদের অন্যতমের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। সে সকলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক—তাহাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে—তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহা বুঝিতেন, এবং আজীবন এ কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারাই বুঝিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত উহার অতি সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও 'পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা ব্রতভঙ্গ' জিনিসটার উপর তাঁহার ঘৃণা ছিল। তিনি প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, "আর যাহা হয় হউক,

ত্রুটি যেন কদাপি না হয়।” বৈধব্যের শ্বেতবাস তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা ও সত্যের চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে শিক্ষাপ্রণালী এই সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না। চপলমতি, বিলাসিনী এবং জাতীয়তাভ্রষ্টা নারী শত বাহ্য পারিপাট্য সত্ত্বেও তাঁহার মতে শিক্ষিতা নহে, বরং অধঃপতিতা। পক্ষান্তরে, কোন আধুনিকভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীনকালসুলভ একান্ত নির্ভরতা ও পরমভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইলে এবং শ্বশুরগৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীন নিষ্ঠা বজায় রাখিলে, তিনি তাঁহার মতে ‘আদর্শ হিন্দু-পত্নী’ বলিয়া বিবেচিতা হইতেন। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোকদেখান ব্যাপার নহে। আর যে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষাপদবাচ্যই নহে।

ভাবী আদর্শ রমণীর গুণাবলীর আভাস যদি দৈবাৎ কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আশায় তিনি সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিতেন। তিনি ভাবিতেন কতকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইবেই, এবং তৎসঙ্গে অধিক বয়সে বিবাহ ও হয়ত কতকটা নিজের পছন্দ মত পতিনির্ব্বাচন—এই দুইটিও আসিবেই। সম্ভবতঃ ইহাই অন্য সকল উপায় অপেক্ষা প্রকৃষ্টতররূপে বালবৈধব্যজনিত সমস্যাসমূহের সমাধান করিবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন বাল্য-বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি হয়, তখন সমাজ উহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছিলেন। বিবাহ বিলম্বে হইলে অপর যে-সকল দোষের

প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ঐ উপায়ে তাঁহারা সেইগুলিকে পরিহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণী একেবারে অতীতের ধ্যানশক্তি-রহিতা হইবে ইহা তিনি কিছুতেই চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মভাব খোয়াইয়া নহে। তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, যাহাতে সমগ্র সমাজ-শরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহাই আদর্শ শিক্ষা। উহা এরূপ হইবে যে কালে উহার প্রভাবে বর্ত্তমান প্রত্যেক নারী একাধারে ভারতে প্রাচীন নারীসমাজের সর্ব্বপ্রকার মহিমা বিকশিত করিতে পারিবে।

অতীতের প্রত্যেক জ্বলন্ত আদর্শ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাজপুত ইতিহাস এতদ্দেশীয় নারীজাতির আদর্শ, তেজ ও সাহসে ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু এই অত্যুষ্ণ দ্রব ধাতুকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। ভারতে যত নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রাণী অহল্যাবাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। ভারতীয় সাধুর পক্ষে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার লোকহিতকর কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া ঐরূপ ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি ভাবী নারীর মহত্ত্ব তাঁহার মহত্ত্বের ঠিক প্রতিরূপ হইবে না; ইহা তাঁহাকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আগামী যুগের স্ত্রীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে। পবিত্র শান্তি ও স্বাধীনতার আধারভূতা সাবিত্রী যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহাই আদর্শ অবস্থা। কিন্তু ভবিষ্যতে নারীকে ইহার সহিত মলয় মারুতের কোমলতা ও মাধুর্য্যের বিকাশ দেখাইতে হইবে।

নারীকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে হইবে, উহার হ্রাস হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম, বা বালিকাবিদ্যালয় ও কলেজের তিনি যে প্ল্যান (বা কল্পনা) করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদ্বর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত স্থানের ব্যবস্থা থাকিত। তিনি বলিতেন—যাঁহারা তথায় বাস করিতেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যান-সংস্করণ এবং পশুচর্য্যা—এগুলি দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে হওয়া চাই। সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমে যে উচ্চ লক্ষ্যের সমধিক বিকাশ দেখা যায়, তাহার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ। ধর্ম্মই এই নূতন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির অস্থিমজ্জারূপ হইবে, ইহাদিগেরই আশ্রয়ে ঐগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। আর এবম্বিধ বিদ্যালয়সকল শীতঋতুর অবসানে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয় মাসকাল হিমালয়ে থাকিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিবে। এইরূপ এক শ্রেণীর নারীর সৃষ্টি হইবে, যাহারা ধর্ম্মরাজ্যে "বাশি-বাজুক"দিগেরই* সদৃশ হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহারাই নারীগণের সমস্যার সমাধান করিবে। তাহাদের অন্য কোনও গৃহ থাকিবে না; যেখানে তাহারা কাজ করিবে তাহাই

* Bashi Bazouks—ইহারা খলিফাদিগের শরীররক্ষক ছিল। বহুকাল যাবৎ এইরূপ প্রথা ছিল যে, যে-সকল সৈনিককে তুর্কী গার্ডদলে ভর্ত্তি করা হইত তাহাদিগকে শৈশবে সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়া মুসলেমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লালনপালন করা হইত। এইরূপে তাহাদের ধর্ম্মে যারপরনাই অনুরাগ জন্মাইত এবং দেশের ও রাজার সেবাই পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনস্বরূপ হইত। সমগ্র ইউরোপে তাহারা হিংস্র-প্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মিশরে নেপোলিয়ন তাহাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন।

তাহাদের গৃহ হইবে; ধর্ম্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন বন্ধন থাকিবে না; এবং গুরু, স্বদেশ ও আপামর সাধারণ—এই তিনের প্রীতি ব্যতীত অপর কোন প্রীতি থাকিবে না। তাঁহার কল্পনা কতকটা এইরূপ ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন, এবং তিনি এইরূপেই তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীতে তিনি 'শক্তি' এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন, কিন্তু শক্তি কাহাকে বলে—এই বিষয়ে তিনি কি কঠোরভাবে বিচার করিতেন! নিজেকে জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস—এ দুয়ের কোনটিরই তিনি প্রশংসা করিতেন না। মৌন, মাধুর্য্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত সেই প্রাচীন-কালের চরিত্রসমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না। সেই সঙ্গে আবার বর্ত্তমান যুগে ভারতের চিন্তা ও জ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোক-দিগেরও সমান অধিকার আছে। সত্যে লিঙ্গবিচার চলে না। যাহাতে আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহে, এরূপ কোন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতিকে তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্র ও মনের রমণীসুলভ দুর্ব্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন। এবং আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ক্রমশঃ অধিক-সংখ্যক স্ত্রীলোক এইরূপ উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসার্হ হইবেন।

স্বভাবতঃ, তিনি বিধবাগণের মধ্য হইতে প্রথম শিক্ষয়িত্রীদল

সংগৃহীত হইবে, এইরূপ আশা করিতেন। ইঁহারা পাশ্চাত্ত্য দেশের মঠাধিকারিণীদিগের অনুরূপ হইবেন। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও তিনি কোনরূপ সঙ্কল্প করেন নাই। তিনি শুধু বলিতেন, "জাগো! জাগো! সঙ্কল্পসকল কালে আপনা হইতেই পরিপুষ্ট এবং কার্য্যে পরিণত হয়।"—এগুলি তাঁহারই কথা। তথাপি উপকরণ উপস্থিত হইলে—উহা যেখান হইতে আসুক না কেন—তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। কেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক সহজ ও সবল-চরিত্র এবং বুদ্ধিসহায়ে সত্যপথে থাকিয়া আপনাকে উচ্চতম আদর্শের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিতে পারিবেন না—এবিষয়ে তিনি কোন কারণই খুঁজিয়া পাইতেন না। অসৎ কর্ম্মের ভারে মন পীড়িত হইলেও সে বোঝা সরলতার দ্বারা দূর করা চলে। নারীদের উন্নতিবিষয়ে উৎসুক জনৈক আধুনিক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্বাধীনভাবে সকল উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করা চাই," স্বামীজীও স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, এবং ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ করিতেন না, কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতার বিকাশের কল্পনা করিতেন, তাহা আন্দোলন, হৈ চৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া ফেলার দ্বারা সাধিত হইবার নহে। উহা পরোক্ষভাবে, নীরবে এবং ভিতর হইতে আপনাআপনি সাধিত হওয়া চাই।' প্রথম, নারীকে সমাজের আদর্শগুলি নতশিরে গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণশালী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্দ্দেশ ও সুযোগগুলি অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল কর্ত্তব্য পালন

করিয়া ও ঐ সকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয়ভাবাপন্ন হইবেন এবং উন্নতির এইরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

*   *   *

স্বামীজীর চক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যার-পর-নাই মূল্যবান ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষেও বিবাহ বা তৎসংশ্লিষ্ট যে-কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। ...

কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি নারী হইতে ভয় পাইতেন না, তিনি ভয় করিতেন প্রলোভনকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাকে নারীর সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার শিষ্যা, কার্য্যের সহায়ক, এমন কি, বন্ধু ও খেলার সাথীও ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের এই সকল বন্ধুদের সহিত ব্যবহারে তিনি প্রায় সকল সময়েই ভারতের পল্লী-প্রথা অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কোন একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লইতেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে মহত্ত্ব ও চরিত্রবলেরই অন্বেষণ করিতেন। তিনি আমেরিকায় দেখিয়াছিলেন, মেয়েরা নৌকা চালাইতেছে, সাঁতার দিতেছে এবং নানাপ্রকার খেলা করিতেছে, অথচ "তাহাদের একবারও মনে পড়িতেছে না যে তাহারা বেটাছেলে নহে" (এগুলি তাঁহার নিজের মুখের কথা)—এ সকল বিষয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। ঐ ভাবে

তাহাদের মধ্যে যে আদর্শটির বহিঃপ্রকাশ তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই আদর্শটিকে তিনি পূজা করিতেন।

সন্ন্যাসীদের শিক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা বিশেষ করিয়া বলিতেন যে, সন্ন্যাসী নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই ভাবিবেন না, কারণ তিনি ঐ দুয়ের পারে গিয়াছেন। শিষ্টাচার বা ঐরূপ যাহা কিছু লিঙ্গভেদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাই তাঁহার নিকট অতি ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইত। পাশ্চাত্ত্যে যাহাকে chivalry (মেয়েদের প্রতি একটু সৌজন্য-প্রকাশ) বলে, তাঁহার মতে তাহার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে অপমানই করা হয়। কোন কোন লেখক বলেন যে, মেয়েদের জ্ঞান মোটামুটি রকমের হইলেই যথেষ্ট, কোনও বিষয়ে তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের প্রয়োজন নাই; কিন্তু স্বামীজীর নিকট ঐরূপ মত অতি নীচ ও হেয় বলিয়া মনে হইত। মানবের অন্তরাত্মা চায় স্বাধীনতা—আমাদের দৈহিক গঠন ঐ স্বাধীনতার উপর যে-সকল বন্ধন জোর করিয়া আনিয়া দিয়াছে, কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই উচিত উহাদের অতিক্রমের চেষ্টা করা।

প্রাচ্যের ন্যায় তিনি মনে করিতেন আদর্শ-পত্নী হইতে হইলে, একমাত্র স্বামীর প্রতি জ্বলন্ত, হ্রাসবৃদ্ধিহীন নিষ্ঠা থাকা চাই। ... তিনি কখনও কোন সামাজিক আদর্শকে আক্রমণ করিতেন না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডপ্রত্যাগমনকালে, তথায় নামিবার দুই-এক দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে অবস্থানকালে আমি যেন ইউরোপের সামাজিক আদর্শগুলিকে —যেন আমি উহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করি নাই, এমনি

ভাবে—পুনরায় গ্রহণ করি।—ইউরোপ বা আমেরিকার বিবাহিতারা তাঁহার নিকট অবিবাহিতাদের অপেক্ষা কম সম্মান পাইতেন না। ঐ সমুদ্রযাত্রাকালে, জাহাজে কতকগুলি পাদ্রি কয়েকগাছি রৌপ্যনির্ম্মিত বিবাহ-বলয় সকলকে দেখাইতেছিল; ঐগুলি দুর্ভিক্ষের দারুণ সঙ্কটকালে তাহারা তামিল রমণীগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। কথায় কথায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কুসংস্কারবশতঃ অঙ্গুলী বা মণিবন্ধ হইতে বিবাহ-অঙ্গুরী বা বিবাহ-বলয় খুলিয়া দিতে আপত্তি করিয়া থাকে, এই কথা উঠিল। শুনিয়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে খেদপূর্ণ অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা উহাকে কুসংস্কার বলিতেছ? উহার পশ্চাতে যে মহান্ সতীত্বের আদর্শ রহিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?"

কিন্তু বিবাহ দ্বারা আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা-লাভের কতকটা যে সহায়তা হয় তাহা দেখিয়াই তিনি উক্ত সংস্কারটির গুণাগুণ বিচার করিতেন। তিনি একদিন তর্কচ্ছলে স্বীকার করিয়াছিলেন, "বিবাহের পারে যাইবার জন্য যে বিবাহ করা—তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।" তাঁহার গুরুদেবের, তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দের এবং তাঁহার শিষ্য স্বরূপানন্দের যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার বিবেচনায় আদর্শ বিবাহ।...

তিনি সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে আচার্য্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদলের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এবং যে আচার্য্যের শিষ্যগণ সকলেই গৃহস্থ ও সংসারী, তাঁহার সৈন্য নাই, এই কথা বলিতেন।...তথাপি বিবাহ

যে অনেকের পক্ষে একটি পথ, একথা তিনি মোটেই বুঝিতেন না, তাহা নহে। তিনি এক বৃদ্ধ দম্পতির যে গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। পঞ্চাশ বৎসর একত্র বাসের পর তাহারা দরিদ্র-নিবাসের (Work-house) দরজায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথম দিনের অবসানে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কি! মেরী, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার আমি তোমাকে দেখিতে ও চুম্বন করিতে পাইব না? আমি যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে ঐরূপ করিয়া আসিয়াছি।" তাহার ঐ উচ্চভাবের কথা ভাবিয়া স্বামীজী অতি আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন—একবার ভাবিয়া দেখ! একবার ভাবিয়া দেখ! এরূপ সংযম ও নিষ্ঠার নামই মুক্তি! এই দুইটি প্রাণীর পক্ষে বিবাহই প্রশস্ত পথ।

তিনি বরাবর সমান দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। একটি বালিকার ধর্ম্মজীবনের প্রতি অনুরাগ দ্বাদশ-বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সে বিবাহ-প্রস্তাবসমূহের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে। এবং তিনিও বাড়ীর লোকদিগকে নানারূপ বুঝাইয়া ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ... এরূপ উচ্চভাবাপন্নকে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া তাঁহার চক্ষে মহা গর্হিত আচরণ বলিয়া মনে হইত। ...

তিনি বলিতেন, বিধবাগণের সতীত্বরূপ স্তম্ভের উপরই সামাজিক অনুষ্ঠানসকল দণ্ডায়মান। তিনি ইহাও ঘোষণা

করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পুরুষদিগের জন্যও ঠিক সমান উচ্চ আদর্শ থাকা উচিত। প্রাচীন আর্য্যদিগের একটি চিরাচরিত প্রথা ছিল—বিবাহকালে এক অগ্নি প্রজ্বালিত হইত এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্রে ঐ অগ্নির উপাসনা করিতেন। এই অনুষ্ঠানটি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও দায়িত্ব সমান। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে সীতারও যেমন রামের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, রামেরও সীতার প্রতি তেমনি নিষ্ঠা বর্ণিত আছে।

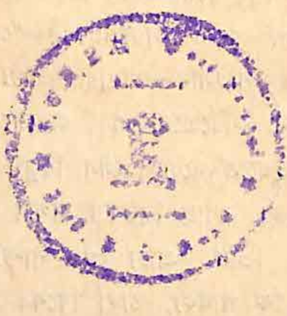
পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিবাহসংক্রান্ত যে-সকল সামাজিক সমস্যা রহিয়াছে, সে-সকল স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাত্ত্যে একটি বক্তৃতার এক স্থলে তিনি সবিস্ময়ে বলিতেছেন, "এই সকল দুর্দ্দান্ত স্ত্রীলোক—যাহাদের মন হইতে 'সহ্য কর, ক্ষমা কর' প্রভৃতি শব্দ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।" তিনি ইহাও স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না যে, যেখানে বিবাহ-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিলে ভবিষ্যৎ মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব ও সাহসের কার্য্য। তিনি সর্ব্বদা দেখাইয়া দিতেন যে ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শ-গুলির মধ্যে পরস্পর আংশিক আদানপ্রদান দ্বারা উভয়কেই একটু সতেজ করিয়া লওয়া আবশ্যক। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানকেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া দোষারোপ করিতেন না। এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে ঐগুলি এমন কোন অনাচার দূর করিবার চেষ্টা হইতেই ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা উহাদের সমালোচক

মহাশয় খুব সম্ভবতঃ নিজের একগুঁয়েমিবশতঃই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঘড়ির দোলনাটা কোন একদিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষে বিবাহ পাত্র-পাত্রীর নিজেদের পছন্দমত না হইয়া অভিভাবকগণের ব্যবস্থানুযায়ীই হইয়া থাকে—এই কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিলেন, "ওঃ! এদেশে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণাই সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে! ইহার কতকটা অবশ্য সকল সময়েই ছিল। কিন্তু এখন ইউরোপীয়গণ ও তাহাদের রীতিনীতিগুলিকে দেখিয়া লোকের এই কষ্টবোধ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এখন সমাজ জানিতে পারিয়াছে যে, অন্য একটা রাস্তাও আছে।"

জনৈক ইউরোপীয়কে তিনি আবার বলিলেন, "আমরা মাতৃভাবকে বাড়াইয়া তুলিয়াছি, তোমরা জায়াভাবকে; এবং আমার মনে হয়, একট আদানপ্রদান দ্বারা উভয় পক্ষই লাভবান হইতে পারে।"

তাহার পর তাঁহার সেই স্বপ্নের কথা; তিনি জাহাজে আমাদের নিকট উহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন—"স্বপ্নে আমি দুই ব্যক্তির গলা শুনিতে পাইলাম—তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিবাহাদর্শের আলোচনা করিতেছে, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যাহা এখনও জগতের কাছে হিতকর বলিয়া অপরিত্যাজ্য।" এই দৃঢ়বিশ্বাসহেতুই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সামাজিক আদর্শগুলির মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে অত সময় অতিবাহিত করিতেন।



तन्नो हंसः प्रचोदयात